২০০৩

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ □ ৮ম সংখ্যা

৩১ অক্টোবর, ২০০৩ ঈসাব্দ

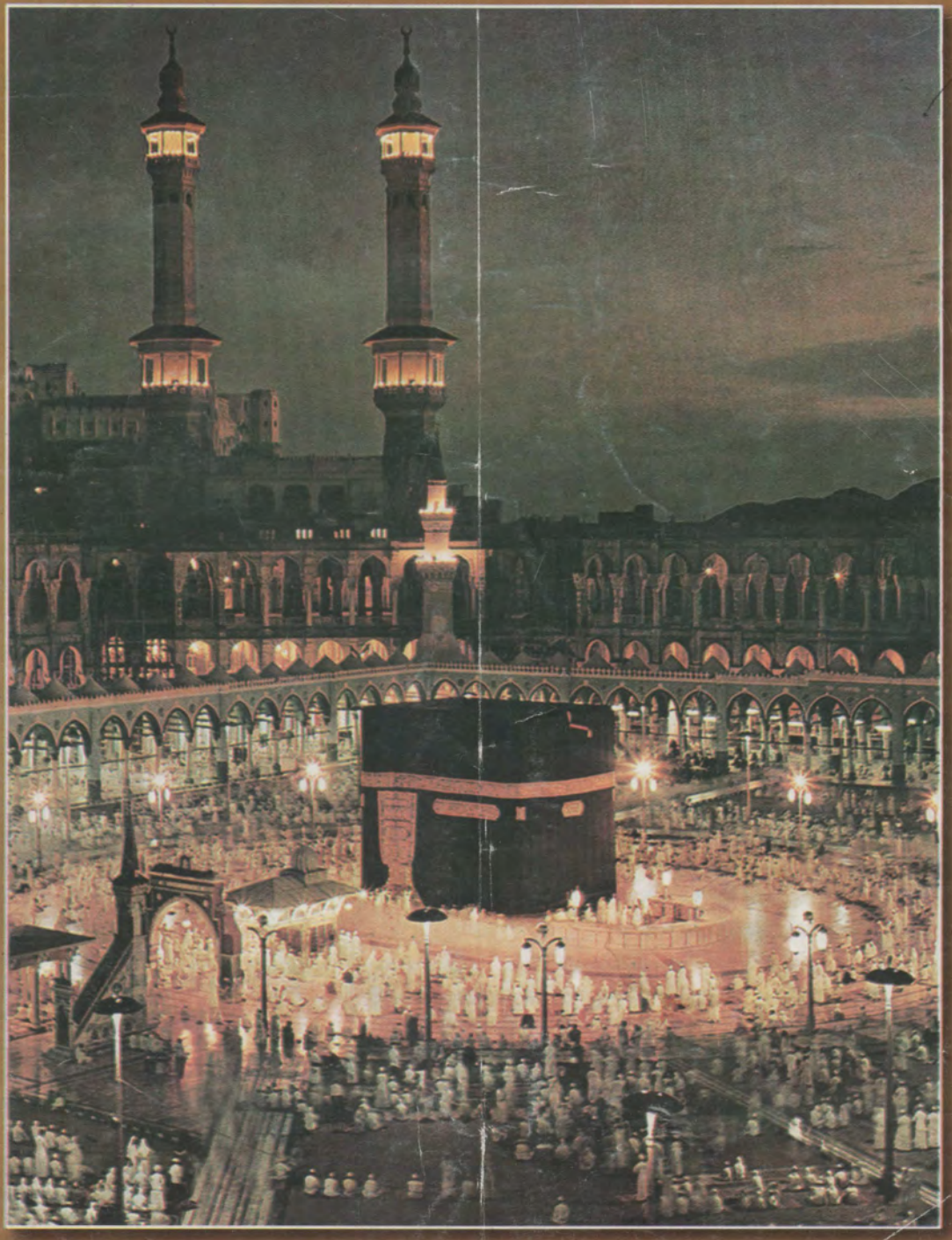

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

ইসলাম ও আহমদীয়তের বিজয় মসজিদ আবাদ রাখার মাঝে নিহিত

মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। কেবলমাত্র এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্যে মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকে। এখানে একত্ববাদী সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত। মসজিদ নির্মাণ করা খুবই পুণ্যের কাজ। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- মান বানা লিল্লাহি মাসজিদান বালাল্লাহু লাহু বায়তান ফিল জান্নাহ্ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্‌তাআলা তার জন্যে বেহেশ্‌তে ঘর নির্মাণ করেন। এ উদ্দেশ্যাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সারা বিশ্বে আল্লাহ্‌র ইবাদতগাহ্ অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণ করে যাচ্ছে। আহমদী জামাতকে মসজিদ নির্মাণকারী সংগঠনও বলা হয়ে থাকে।

বিগত ৩রা অক্টোবর, ২০০৩ তারিখ আল্লাহ্‌তাআলার খাস ফযলে আহমদী জামাতের পক্ষ থেকে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) লন্ডনের মরডেন এলাকায় মসজিদ বায়তুল ফুতূহ্ নামে একটি বিরাট মসজিদের শুভ উদ্বোধন করেন। এতে নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদাভাবে চার হাজার লোক নামায পড়তে পারবে। আর সমস্ত কমপ্লেক্সটিতে প্রায় দশ হাজার লোক নামায পড়তে পারবে। এ মসজিদের উদ্বোধন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। জামাত অনেক বাহবা কুড়িয়েছে। কিন্তু কেবল মসজিদ নির্মাণ করলেই চলবে না। মসজিদ আবাদ রাখতে হবে। মসজিদ যাতে নামাযের মুসল্লীদের দ্বারা সর্বদা ভরপুর থাকে সে দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। মসজিদের উদ্বোধন করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) তাঁর খুতবায় বলেছেন, 'মসজিদ নির্মাণের পরই কাজ শেষ হয়ে যায় না। বরং খাস আল্লাহ্‌তাআলার খাতিরে ইবাদতকারী নামাযীদের দ্বারা একে আবাদ রাখতে হবে। মসজিদের আসল সৌন্দর্য এর নামাযীদের সাথে সম্পৃক্ত।'

দোয়া করার সময় তিনি (আইঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক আহমদীকে এ সৌভাগ্য দান করুন যেন, সে যে মসজিদই নির্মাণ করবে এর একান্ত ভিত্তি যেন আল্লাহ্‌র তাকওয়ার ওপরে হয় আর সর্বদা আমরা যেন আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদতকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হই। হুযূর (আইঃ) এ দোয়াও করেন, 'এ মসজিদও এবং বিশ্বের অন্য স্থানে যেখানেই জামাতের মসজিদ রয়েছে তা যেন প্রয়োজনের তুলনায় ছোট হয়ে যায়।' অর্থাৎ নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হুযূর বলেন, 'স্মরণ রাখ! ইসলাম ও আহমদীয়তের বিজয় এসব মসজিদের আবাদের মাঝে নিহিত। অতএব হে আহমদীয়া! ওঠ, আর এসব মসজিদের পানে ধাবিত হও এবং এগুলোকে আবাদ রাখ।'

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অনেক মসজিদ গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়, বিরান পড়ে আছে। এতে কোন ইবাদতকারী যায় না। খোদা না করুন আমাদের মসজিদগুলোর অবস্থা যেন এমনটি না হয়। আমাদের মসজিদগুলো যেন সর্বদা মুসল্লীদের দ্বারা ভরপুর থাকে। আল্লাহ্ করুন তা-ই যেন হয়, আমীন।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা

১৬ কার্তিক ১৪১০ বঙ্গাব্দ ৪ রমযান ১৪২৪ হিঃ কাঃ
৩১ ইহসান ১৩৮২ হিঃ শাঃ ৩১ অক্টোবর, ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
ন, ন, মোহাম্মদ সালেক	-	কানাডা
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ডাঃ মাহবুবুল ইসলাম	-	অষ্ট্রেলিয়া
সৈয়্যদ মোহাম্মদ রেজা শাকিল	-	ফ্রান্স

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

রোযা বোঝা নয়

বছরের চাকার নিয়ত আবর্তনে আবার এসেছে পবিত্র মাহে রমযান। আধ্যাত্মিক ভুবনে নব বসন্তের সমারোহে রোযা ব্রত বা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্ম-শুদ্ধির মাস, পরম করুণাময় আল্লাহ্‌কে একান্ত করে পাবার মাস। রমযানের সাধনার পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন-মানুষ যত কাজ করে তা নিজের জন্যে আর রোযা রাখা হয় আমার জন্যে। সুতরাং আমি নিজেই এর পুরস্কার বা আমি স্বয়ং এর পুরস্কার দেবো। কথাটা একটু তলিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই-একজন রোযাদার একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণেই তাঁর জন্যে পানাহার প্রভৃতি বৈধ কাজগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে পরিত্যাগ করে। দিনের বেলায় ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করে, স্ত্রী-সংসর্গ থেকে বিরত থাকে এবং রাতে ঘুম কমিয়ে নফল ইবাদতের মাধ্যমে রাতকে জাগ্রত রাখে। এ সবই একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ পালনার্থে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে করা হয়; বরং এটা বলা যায় যে, সে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে তাঁর নিজের মাঝে ঐশী গুণাবলী আত্মস্থ ও ধারণ করার জন্যে ইবাদত করে থাকে।

মহান আল্লাহ্‌তাআলা খাবার খান না,তাঁর পিপাসা লাগে না, বংশ বৃদ্ধির জন্যে তাঁর প্রজননের প্রয়োজন নেই। এমনকি নেই তাঁর নিদ্রা-তন্দ্রারও প্রয়োজন। তাঁর বান্দা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এ সব কাজও পরিত্যাগ করে। আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলীর প্রকাশক হওয়ার জন্যে সিয়াম বা রোযার মাধ্যমে সেই সাধনাই সে করে থাকে। আল্লাহ্‌র মহান গুণাবলীর জ্যোতিতে জোর্তিময় হয়ে এক ধাপ এগিয়ে সে হয় নীতিবান মানুষ, বা-খোদা ইনসান তথা আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষ। আল্লাহ্‌তে বিলীন হয়ে সে তাঁর খলীফা হওয়ার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে। তাই বলা হয়েছে, রোযার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্ নিজেই। আর আল্লাহ্‌র সাথে রোযার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনই সেই মহাপুরস্কার। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলের জন্যে রোযাকে সহজ করে দিন এবং সিয়াম তথা রোযার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বুঝার তৌফীক আমাদিগকে দান করুন যেন আমাদের জন্যে রোযা বোঝা না হয়ে, বরং সোজা ও মজার হয়।

- নির্বাহী সম্পাদক

এবারকার ফিতরা ও ফিদিয়ার হার মাথাপিছু নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছে ঃ

ফিতরা ঃ পূর্ণহার ৪০/= টাকা
অর্ধেকহার ২০/= টাকা

ফিদিয়া ঃ (ক) ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া শহরের জন্যে ঃ ৭০০/= টাকা
(খ) অন্যান্য স্থানের জন্য ঃ ৫৫০/= টাকা

বিঃ দ্রঃ স্বচ্ছল ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী অধিক হারে ফিদিয়া দিতে পারেন। যারা রোযা রেখেছেন তারা অধিক পুণ্যের লক্ষ্যে ফিদিয়াও দিতে পারেন।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ বাকারাহ্-২	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ রোযার মাহাত্ম্য	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ	৩-৪
অমৃত বাণী ঃ রোযার মাহাত্ম্য ঃ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ	৪
জুমুআর খুতবা ঃ ওয়াকেফীনে নও সন্তানদের তরবিয়ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-১১
মসীহ্ (আঃ) হিন্দুস্তান মেঁঃ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	১১-১২
মূলাকাৎ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব আবূ জাকের	১৩
ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)	ঃ সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ - প্রফেসর মোহাম্মদ আমীর হোসেন	১৪-১৬
রোযা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য মূল ঃ মোহতরম আব্দুল মাজেদ তাহের সাহেব	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৭-১৯
ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা	ঃ জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	২০-২১
কবিতা ঃ ● পুণ্য-গাঁথা, ● ধন্য জীবন	ঃ ● জনাব মির্যা আলী আকন্দ, ● মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী	২১
যাকাত ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২২-২৩
কবিতা ঃ পূর্ণ কর, ● খলীফাতুল মসীহ রাবে'(রাহে)	ঃ ● জনাব মোহাম্মাদ এহসানুল হাবীব জয় ● জনাব আবুল হাসান	২৩
হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সুসংবাদপ্রাপ্ত সন্তান মূল ঃ সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব কাওসার আলী মোল্লা	২৪-২৫
নতুনদের পাতা ঃ		
● সেহ্রী খাওয়ার ফযিলত	ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন	২৫-২৬
● রূহ-মীযান	ঃ জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়	২৭-২৮
● ওয়াকফে নও ও তাদের পিতামাতাদের উদ্দেশ্যে দু'টি কথা	ঃ সৈয়দ আব্দুল হান্নান	২৯-৩০
সংবাদ	ঃ	৩১-৩২

প্রচ্ছদ ঃ পবিত্র মক্কায় আল্লাহ্র ঘর কা'বা শরীফ

আবশ্যক

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা-এর অফিসের জন্য একজন হিসাবরক্ষক জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। উক্ত পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম এইচ, এস, সি পাস সহ ভাল কম্পিউটার জ্ঞান, বাংলা ও ইংরেজীতে টাইপ করার সন্তোষজনক গতি থাকতে হবে।

ইচ্ছুক আহমদী প্রার্থীগণকে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে আগামী ১৫/১১/২০০৩ ইং তারিখের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও সত্যায়িত দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সহ দরখাস্ত ঢাকা অফিসে জমা দেয়ার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে। যোগ্যতম প্রার্থীর বেতন ও ভাতা আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

- **জুলফিকার হায়দার**
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা

নবী নেতা পুস্তক সংগ্রহ করুন

নবী নেতা পুস্তকখানা পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। এ নবী করীম (সঃ)-এর একখানা গবেষণামূলক সীরাত গ্রন্থ। এ পুস্তক খানা প্রণয়ন করেছেন হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)। অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব। প্রত্যেক আহমদীর নিজস্ব একখানা কপি থাকা আবশ্যক। এর বিনিময়মূল্য মাত্র ৫০/- টাকা। কেন্দ্রীয় আহমদীয়া লাইব্রেরী থেকে এ মূল্যবান পুস্তকখানা সংগ্রহ করুন।

পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা

পাক্ষিক আহমদীর চাঁদার বছরের ৩ মাস অতিক্রান্ত। এখনও যারা ২০০৩-০৪ বছরের চাঁদা আদায় করেন নি তাঁদেরকে সত্বর চাঁদা আদায় করার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যারা স্থানীয় জামাতে চাঁদা দেন তাদেরকে রশিদের একটি ফটো কপি খাকসারের বরাবরে পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। নচেৎ অফিস তাদের চাঁদার ব্যাপারে অনবহিত থাকার কারণে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না। চাঁদা আদায়ের খবর কেন্দ্রীয় অফিসে আসে অনেক পরে। স্থানীয় জামাতের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করা যাচ্ছে। তারা যেন অর্থ বিভাগে চাঁদার রশিদ পাঠানোর সাথে সাথে অত্র অফিসে প্রত্যেক মাসের চাঁদা দাতার একটি তালিকা প্রেরণ করে আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূরা আল্ বাকারাহ্ - ২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۴﴾

১৮৪। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা ফরয করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের[২০৬] জন্যে ফরয করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهٗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

১৮৫। নির্দিষ্ট কয়েকদিন মাত্র, তবে তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ বা সফরে আছে তার ক্ষেত্রে অন্যান্য দিনে (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করা বিধেয়, আর যারা এর (অর্থাৎ রোযার) সামর্থ্য রাখে না[২০৭] তাদের জন্যে 'ফিদিয়া' হলো ঃ একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো। অতএব যে স্বেচ্ছায় ভালকাজ করে তা অবশ্যই তার জন্য উত্তম। আর তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

১৮৬। রমযান[২০৭-ক] সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) আল্ কুরআন নাযেল[২০৭-খ] করা হয়েছে মানবজাতির জন্য[২০৮] এক মহান হেদায়াত এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীস্বরূপ এবং 'ফুরকানস্বরূপ (অর্থাৎ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে) অতএব তোমাদের মাঝে যে এ মাসকে পায় সে যেন এতে রোযা রাখে; কিন্তু যে অসুস্থ বা সফরে থাকে তার জন্য অন্যান্য দিনে[২০৯] (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করা বিধেয়ঃ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না, আর তিনি চান তোমরা যেন (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি যে তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন সেজন্যে তোমরা যেন আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর আর তোমরা যেন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২০৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন কোন না কোন আকারে সকল ধর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। "অধিকাংশ ধর্মগুলোতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মাঝে, উপবাস ব্রত একটি সাধারণভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এ ধরনের নির্দেশ নেই, সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাকিদে অনেকেই উপবাস করে থাকেন" (এনসাই-বৃট)। সাধু পুরুষ ও দিব্যজ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্কসমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে কতকটা মুক্তিলাভ একান্তই প্রয়োজন। তবে ইসলাম এ উপবাস ব্রতের মাঝে নবরূপ, নব অর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছে। ইসলাম রোযাকে (উপবাস পালন) পূর্ণমাত্রার আত্মোৎসর্গস্বরূপ মনে করে থাকে। যিনি রোযা পালন করেন তিনি যে কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় হতেই বিরত থাকেন তেমন নয়, বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়া-কলাপ থেকেও দূরে থাকেন। অতএব যিনি রোযা রাখেন তিনি আত্মত্যাগে তাঁর প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেন, প্রয়োজনবোধে তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তিনি তাঁর সবকিছু, এমনকি তাঁর জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত নন।

২০৭। 'ইয়ুতিকূনাহু'র অর্থ করা হয়েছে, যাদের পক্ষে বা যারা অতি কষ্টে এটা (রোযা) করতে পারে। অন্য পাঠ 'ইয়ুতাঈকূনাহু' এ অর্থকে সমর্থন করে (জরীর)। এ আয়াতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসীকে রোযার ব্যাপারে কিছুটা রেহাই বা সুবিধা দেয়া হয়েছে- অসুস্থ, ভ্রমণরত এবং অতি দুর্বলদেরকে। 'ইয়ুতিকূনাহু'র অর্থ এখানে 'যারা রোযা রাখতে অসমর্থ' হতে পারে (লিসান ও মুফরাদাত)। সমস্ত বাক্যটির অর্থ এরূপও করা হয়েছে, রোযা রাখা ছাড়াও, অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 'গরীবদেরকে খাওয়াতে পারেন'। সে ক্ষেত্রে 'ইয়ুতিকূনাহু'র 'হু' সর্বনামটি একজন গরীবকে 'খাওয়ানোর' পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে।

২০৭-ক। 'রযমান' চান্দ্রমাসগুলোর নবম মাস। শব্দটি 'রামাযা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'রামাযাস্ সায়িমু' অর্থ রোযা রাখার কারণে রোযাদারের ভিতরটা তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে (লেইন)। মাসটির নামকরণ এ কারণে হয়েছে ঃ (১) রোযার কারণে এ মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়, (২) এ মাসের ইবাদত-বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়, (আসাকির ও মারদাওয়াই), (৩) এ মাসে মানুষের তপস্যা ও সাধনা তার মনে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। 'রমযান' নামটি ইসলামের অবদান। এ মাসটির পূর্বনাম ছিল 'নাতিক' (কাসীর)।

২০৭-খ। রমযান মাসের চব্বিশ তারিখে হযরত রসূলে করীম (সঃ) প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী পেয়েছিলেন (জরীর)। এ রমযান মাসেই জিব্রাঈল প্রতি বছর পূর্বে নাযেলকৃত সমস্ত বাণী রসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট পুনরাবৃত্তি করতেন। এ ব্যবস্থা মহানবী (সঃ)-এর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর জীবনের শেষ বছরের রমযান মাসে প্রধান ফিরিশ্‌তা জিব্রাঈল পূর্ণ কুরআনকে মহানবী (সঃ)-এর কাছে দু'বার পাঠ করে শুনান (বুখারী)। এ হিসেবে বলা যেতে পারে, সমগ্র কুরআনই রযমান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে।

২০৮। 'আল্ কুরআন' শব্দটি 'কারাআ' হতে উৎপন্ন। 'কারাআ' অর্থ সে পাঠ করেছিল, সে বাণী পৌঁছিয়েছিল, সে সংগ্রহ করেছিল। 'কুরআন' অর্থ ঃ (১) পঠনের উপযোগী পুস্তক, যা বার বার পাঠ করা যায়; কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত পুস্তক (এন্‌সাইক্লো বৃট.), (২) একটি পুস্তক কিংবা বাণী যা পৃথিবীর সর্বত্র নিয়ে যাওয়া ও পৌঁছানো প্রয়োজন, কুরআনই একমাত্র পুস্তক যার বাণী সারা বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। কেননা যেখানে অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থাদি স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে কুরআনই একমাত্র অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য এসেছে (৩৪ঃ২৯), (৩) এমন গ্রন্থ যা সকল সত্যকে ধারণ করে; কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা যাবতীয় জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভান্ডার। এতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর শাশ্বত সত্যগুলো তো স্থান লাভ করেছেই, উপরন্তু সকল অবস্থায় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন নতুন শিক্ষা ও সত্য এতে সংযোজিত হয়ে এটা সর্বকালের জন্য পূর্ণতম গ্রন্থে পরিণত হয়েছে (৯৮ঃ৪; ১৮ঃ৫০)।

২০৯। এ বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি নয়। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র গঠনের জন্য এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে যাতে রোযা রাখার নির্দেশ তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে। এ আয়াতে সেই নির্দেশেরই বাস্তবায়নকে উপলক্ষ্য করে এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বাক্যটি নির্দেশেরই অঙ্গ-বিশেষ। অসুস্থতা, ভ্রমণ শব্দগুলোকে সংজ্ঞায়িত না করে কুরআন মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শব্দগুলোর অর্থ করার ভার ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখিয়েছে।

হাদীস শরীফ

রোযার মাহাত্ম্য

হাদীস ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যখন রমযান মাস আসে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে, বেহেশ্‌তের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় আছে ঃ রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়' (মুত্তাফাকুন আলায়হে)।

ব্যাখ্যা ঃ

রমযান একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ মহিমাময় মাস। মাসে চাঁদ দেখে রোযা রাখ হয় ও এক মাস সিয়াম সাধনার পর নতুন মাসের চাঁদ দেখে ঈদ উদ্‌যাপন করা হয়। রোযা তাকওয়া অর্জনের পাথেয় হিসেবে

চিহ্নিত। অসুস্থ বা অতি বৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তি ব্যতিরেকে প্রত্যেক সাবালক মুসলমান নর-নারীর উপর রোযা ফরয। পবিত্র কুরআন রমযানকে ফরয, তাকওয়া অর্জনের পাথেয় ও খোদার রহমত প্রাপ্তির মাধ্যম বলে আখ্যা দিয়েছে। রযমান সকল ইবাদতের সমষ্টি। এ ইবাদতে মানুষ নিজের সকল ইন্দ্রিয়কে খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাজে লাগায়। দিনে নিজেকে খোদার নির্দেশ পানাহার ও অন্যান্য গুনাহ্ থেকে মুক্ত রাখে আর রাতে খোদার দরবারে ঝুঁকে থাকে। রোযা মানুষের দৈহিক উন্নতি ও খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সোপানস্বরূপ। রমযানে নেকী করার সুযোগ অহরহ ঘটে থাকে। আকাশের দরজা খোলা হয় অর্থ হবে নেকীর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যায়। অপর দিকে যারা রোযা রাখে না তাদের কাছে পুণ্য করার সুযোগ থাকা সত্বেও তা তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় আর এ অর্থে শয়তান শিকলাবদ্ধ হয়। শয়তান শিকলাবদ্ধ হবার আরেকটি অর্থ হলো শয়তান মু'মিনের কাজে বাধা দেবার রাস্তা খুঁজে পায় না কারণ মু'মিনরা নিজেকে বন্দী বানিয়ে নেয় এ কারণে শয়তানী কুমন্ত্রণা বা এমন চিন্তাভাবনা তাদের স্পর্শ করতে পারে না। সারাদিন রোযা রাখে এবং নিজেকে সেই সকল ক্ষতিকর বিষয় হতে রক্ষা করে যা তার রোযাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আর রোযার কল্যাণকে পুরেপুরি পাবার জন্য সে রাতে উঠে খোদাকে ডাকে। এ কারণে শয়তান মু'মিনের নিকেটে যেতে পারে না। এক অর্থ এই দাঁড়ায় যে মু'মিন নিজেকে আল্লাহ্‌র বন্দী বানিয়ে নেয়।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেন ঃ

"রোযাদার সর্বদা এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিবে যে, ক্ষুধার্ত থাকা তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত সে খোদাতাআলার যিক্‌রে মগ্ন থাকবে যাতে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্‌মুখী হওয়া যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য হলো এই, মানুষ একটি রুটি ছেড়ে দিয়ে যা কেবল দেহ প্রতি পালন করে অন্য রুটি ধরে যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ হয়। যারা কেবল খোদার জন্য রোযা রাখে এবং নিছক রুসূম হিসেবে রাখে না, তাদের উচিত আল্লাহ্‌তাআলার হামদ (প্রশংসা), তসবীহ্ (গুণকীর্তন করা) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) পাঠে মগ্ন থাকা, যদ্দরুন অন্য খাদ্যও তারা পেয়ে যায়।' (মলফূযাত- ৯ম খন্ড, পৃঃ ১২৩) আল্লাহ্ করুন আমরা যেন রোযার সকল বরকত হতে কল্যাণ প্রাপ্ত হই, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - **মাওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

রোযার মাহাত্ম্য

❑ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রোযার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখেছেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করা ও আত্মশক্তির জন্যে আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশ্‌ফী-তাকৃত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে অনন্ত জীবেনর প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশীক্রোধ" (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, রোযার অর্থ শুধু ইহা নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে, বরং খোদার যিক্‌র অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। আঁ হযরত (সঃ) রমযান শরীফে অনেক বেশি ইবাদত করতেন। এ দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি মনোনিবেশ (তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্) করা চাই। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিছু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্যে পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্য দ্বারা দৈহিক শক্তি লাভ হয়, একইভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং তদ্বারা আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার নিকট সাফল্য চাও। কারণ, তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে"।

❑ "কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয় বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মাঝেই এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায়, ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং কাশ্‌ফী বা দিব্য-দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারের সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। খোদাতাআলার যিক্‌র বা স্মরণের মাঝে সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ্ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তি এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যেই রোযা রাখে এবং আচার-অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না তার উচিত, সে যেন সর্বদা হাম্‌দ (প্রশংসা কীর্তন), তস্‌বীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা) এবং তাহ্‌লীলের (আল্লাহ্‌র তৌহীদ ঘোষণা) মাঝে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়" (আল্ হাকাম, ১৭/০১/১৯০৭)।

❑ "তৃতীয় বিষয়, যা ইলহামের মূল ভিত্তি, তা হ'ল রোযা। রোযার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষ অনবহিত। প্রকৃত কথা এই যে, যে দেশে মানুষ যায় না এবং যে জগৎ সম্পর্কে সে অবহিত নয় সে এর অবস্থা কী বর্ণনা করবে? রোযা কেবল এটাই নয় যে, মানুষ এ দিনে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকে। বরং এর একটি তাৎপর্য ও এর একটি প্রভাব আছে, যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়। মানুষের প্রকৃতিতে এটা আছে যে, সে যত কম খায় ততই তার আত্মা পবিত্র হয় এবং 'কাশ্‌ফী-শক্তি' (দিব্য-দর্শনের শক্তি) বৃদ্ধি লাভ করে। এতে খোদাতাআলার ইচ্ছা এটাই যে, একটি খাদ্য কম কর এবং অন্যাটিকে বাড়াও" (মলফূযাত, নবম খন্ড পৃঃ ১২৩)।

ওয়াকেফীনে নও' সন্তানদের তরবিয়তের ব্যাপারে বিভিন্ন হেদায়াত

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাস্‌রূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ২৭ জুন, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত ৩৪, ৩৫, ৩৬ আয়াত পড়ে হুযূর (আইঃ) খুতবা দিয়েছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

অনুবাদ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে এবং নূহ্কে এবং ইব্রাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে সমকালীন জগদ্বাসীর মধ্য থেকে মনোনীত করেছিলেন-

এরা এমন বংশধর যারা একে অপরের থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

(স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার মালিক! যা কিছু আমার গর্ভে আছে, আমি তাঁকে (সংসার)-মুক্ত করে তোমার (ধর্মের সেবার) জন্য উৎসর্গ করলাম। অতএব তুমি আমার থেকে তাকে কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

গত জুমুআয় আমি উল্লেখ করেছিলাম, ইসলামের নামে জেহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রচার করা হয়েছে, যার ফলে স্বার্থপররা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ইসলামের অতি সুন্দর স্নেহ-মমতা ও ভালবাসাভরা শিক্ষাকে অতি ভয়ঙ্কর চিত্রে চিত্রায়িত করে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে। তারপর তাদের এত দাম্ভিকতা যে, কেউ যদি তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে তাহলে তাদেরকে ইসলামের শত্রু, অমুকের এজেন্ট বা তমুকের এজেন্ট ইত্যাদি বলে প্রচার করে। তারা বিবেকের দিক থেকে অন্ধ; তারা বুঝতেই পারছে না যে, এভাবে তারা ইসলামের বদনাম করছে এবং সাথে সাথে নিজেদের সন্তানদেরকেও

ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মায়েদের কোল থেকে তাদের সন্তানদের ছিনিয়ে নিচ্ছে। বোনদের কাছ ভাইদেরকে সরিয়ে পৃথক করছে; বৃদ্ধ পিতার অবলম্বন তার যুবক পুত্রকে দূর করে দিয়ে সেই বৃদ্ধ পিতাকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে বাধ্য করছে। কারণ তারা অল্প বয়সী সন্তানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার নাম করে দীনী মাদ্রাসায় ভর্তি করাতে উৎসাহিত করে। তারপর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও স্থায়ী জান্নাতের লোভ দেখিয়ে তাদের সম্পূর্ণভাবে Brain Wash করে (বিবেকের মাথা খেয়ে) নিজেদের স্বার্থে সেসব সন্তানদেরকে ব্যবহার করে। এ ধরনের কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রকরা কখনও চিন্তা করে না যে, সেসব সন্তানদের কী প্রকারের কাজে নিয়োজিত করা হচ্ছে। সামান্যও আল্লাহ্র ভয় তাদের অন্তরে নেই।

অপর পক্ষে অন্য একটি দল আছে বা জামাত আছে যারা ইসলামের প্রকৃত ও সুন্দরতম শিক্ষা পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরছে। যারা আঁ হযরত (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নির্দেশ মতে, তাঁর (সঃ) শিক্ষার উপর আমল করে এবং বলে;

"আব ছোড় দো জেহাদ কা আয়ে দোস্তো খেয়াল

দীন কে লিয়ে হারাম হ্যায় আব জং ও কেতাল- দুররে সামীন)"।

হে বন্ধুগণ! এখন যুদ্ধের ধারণা পরিত্যাগ করুন। ধর্মের খাতিরে আজ যুদ্ধ-বিগ্রহ (তরবারির যুদ্ধ) হারাম করা হয়েছে। তরবারির যুদ্ধকে কেতাল বলা হয়েছে এবং আজ এমন জেহাদকে হারাম করে বৃহত্তম জেহাদের জন্য আহ্বান করা হয়েছে এই বলে যে, আস, আজ ইসলামের সৌন্দর্যকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধর। কুরআন করীমের যুক্তি-প্রমাণকে উপস্থাপন কর। দলিল-প্রমাণ দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে হতবাক করে দাও, নির্বাক করে দাও। দলিল-প্রমাণ এবং ভালবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় কর। এ কেবল মুখের কথাই নয়, বরং তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আজ ইসলামের জীবন মুহাম্মদী মসীহ্র সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তিনি মানুষের হৃদয় জয় করে নিজের অধীনস্থ করে নিয়েছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন, "তরবারির কাজ আমরা কলম দিয়ে করে দেখিয়েছি।"

সুতরাং আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অনুগত পিতামাতারা যুগ-খলীফার আহ্বানে সারা দিয়ে আম্বিয়া ও আবরার (পুণ্যবান)-দের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য নিজ সন্তানদেরকে জন্মের পূর্বেই উৎসর্গ করেছেন এবং করেই চলেছেন। এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেছিলেন, "যেমন হযরত মরিয়মের মা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৬)

হে আমার মালিক! যা কিছু আমার গর্ভে আছে, আমি তাকে (সংসার)-মুক্ত করে তোমার (ধর্মের সেবার) জন্য উৎসর্গ করছি। অতএব তুমি আমার থেকে তাকে কবুল কর আমি জানি না আমার গর্ভে কী আছে। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এ দোয়া আল্লাহ্‌র এত পসন্দ হয়েছিল যে, কুরআন শরীফে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এ সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তার সন্তানদের জন্য, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া অন্যান্য নবীগণের দোয়াসমূহ কুরআন শরীফে সংরক্ষিত আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াকফ (উৎসর্গ)-এর দোয়া স্পষ্ট আছে যেমন এখানে আছে **মুহার-রারান**, হে খোদা! আমি তোমার হেফাযতে আমার সন্তানকে (ওয়াকফ) উৎসর্গ করে দিয়েছি।' কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখবেন এই দোয়া 'হে খোদা! তুমি যে নেয়ামত আমাকে দিয়েছ আমার সন্তানদেরকে দাও। তাদের মাঝেও এ নেয়ামত জারী কর। এ পুরস্কার তাদেরকেও দাও। ...'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে চিল্লা করেছিলেন, সেটাও এ বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত। হুযূর (আঃ) চল্লিশ দিনব্যাপী আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করে বলেছিলেন, "হে খোদা! আমাকে সন্তান দাও, এমন সন্তান দাও যে তোমার গোলাম বা দাস হবে। আমার পক্ষ থেকে তোমার সমীপে একটি উপহার হবে।" তাই এ হচ্ছে 'সুন্নতে আম্বিয়া' (নবীগণের পথ)। সুন্নতে আবরার (পুণ্যবানদের পথ)।

আজকের যুগে উক্ত সুন্নতের উপর আমল করতঃ আহমদী মা-বাবারা যে সমস্ত সন্তানদেরকে ওয়াকফ (উৎসর্গ) করেছেন ও করছেন, এ তো অতি চমৎকার আমল (কর্ম)! তারা এভাবে আসলে জেহাদে অংশ নিচ্ছেন। এ জেহাদ জ্ঞান-বিদ্যা ও কলমের জেহাদ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করা। ইনশাআল্লাহ্ এরাই বিজয় লাভ করবে। এখানে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত আছে। এ ছাড়া বিজয় লাভের আর অন্য কোন পথ নেই যেমন লোক দেখানো নামাযে ধ্বংস বৈ আর কিছু নেই, তদ্রূপ, সেই লোক দেখানো জেহাদেও [যা আজ মৌলভী সাহেবেরা মনে করেন) ধ্বংস বৈ আর কিছুই পাওয়া যাবে না।

কিন্তু যেসব মা-বাবা কুরবানীর পবিত্র উৎসাহ্ নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে নিজ সন্তানদেরকে ইসলামের সেবার জন্য ওয়াকফ করেছেন তাদের উপর আরো কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পিত আছে। কিছুদিন পরপর যদি স্মরণ করানো না হয়, কোন কোন মা-বাবা ভুলেও যান। তাই যদিও "ওয়াকফে নও" বিভাগ বরাবর স্মরণ করাচ্ছে, তারপরও আমি মনে করেছি যে, কিছু কথা এ সম্পর্কে নিজেও বলব।

এ বড় জরুরী বিষয় যা আপনাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন তা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ভাষায় পেশ করছি ঃ

"আমরা যদি ওয়াকফীনে নও এর তরবিয়তের সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে পড়ি তাহলে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অপরাধী হয়ে যাব। তারপর এ কথা বলা যাবে না যে, ব্যতিক্রমস্বরূপ, এ রকম হয়ে গেছে। সুতরাং মা-বাবাদের উচিত সন্তানদের প্রতি তারা নিজেরা যেন গভীর দৃষ্টি রাখেন। যদি তারা, আল্লাহ্ না করুন, বুঝতে পারেন যে, তাদের সে সন্তান স্বভাব-চরিত্র ও প্রকৃতির দিক থেকে ওয়াকফে রাখার মত নয়, তাহলে তারা সততা ও তাকওয়াহ্‌র সাথে যেন জামাতকে জানিয়ে দেন, আমি তো পরিষ্কার সরল সহজ নিয়তে ওয়াকফ করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সন্তানের স্বভাবের মাঝে এমন এমন বিষয় লক্ষ্য করছি। তারপরও যদি নেযামে জামাত আমার সন্তানকে গ্রহণ করে তাহলে আমি তো প্রস্তুত আছিই। নতুবা এ ওয়াকফ বাতেল করে দেয়া যেতে পারে" [খুতবা জুমুআ; ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ইং]।

পিতা-মাতারা সন্তানদেরকে কুরবানীর জন্য পেশ করে দিয়েছেন। জামাত তাদের সঠিক তরবিয়তের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এসব সন্তান জামাতের তরবিয়তি ব্যবস্থার মাঝে মাত্র কয়েক ঘন্টাই থাকে। এ কয়েক ঘন্টার মাঝে যথেষ্ট তরবিয়ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং এসব সন্তানের তরবিয়তের প্রতি পিতামাতাকে দৃষ্টি রাখতেই হবে। এদের জন্মের পূর্বে যেমন আন্তরিকতার সাথে দোয়া করেছেন, এদের ওয়াকফ করেছেন, তেমনই এখনও দোয়া জারি রাখবেন যতদিন না তারা নেযামে জামাতের ব্যবস্থাপনার মাঝে সুন্দরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বরং তারপরও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দোয়া করে যাওয়া উচিত। কারণ কোন্ ব্যক্তি যে পথভ্রষ্ট হয় তা বলা যায় না। অতএব সব সময় উত্তম পরিণামের জন্য দোয়ারত থাকা উচিত। পিতামাতারা সারাজীবন দোয়া করবেন যেন তাদের সন্তান শেষ পর্যন্ত ওয়াকফের প্রতিজ্ঞা পালন বা দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে।

এবার আমি ওয়াকফীনে নও সন্তানদের তরবিয়তের জন্য কয়েকটি বিষয় বলছি যা পিতামাতার জন্য করণীয় এবং এগুলো খুবই জরুরী।

সবচেয়ে জরুরী বিষয় হ'ল ওফাদারী বা প্রতিজ্ঞা পালন। [ওয়ফাদারী অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার উপর কায়েম থাকতে হবে এবং তদনুযায়ী দায়িত্ব ও কতর্ব্য পালন করে যেতে হবে]। এ ছাড়া কোন কুরবানী কুরবানী বলে গণ্য হয় না। এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) পিতামাতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "ওকেফীনে নও সন্তানদেরকে ওয়াফাদারী শিখাবেন। ওয়াকফে নওদের ওয়াকফের সাথে ওয়াফাদারীর বা বিশ্বস্ততার বড় গভীর সম্পর্ক। এমন ওয়াকফে যিন্দেগী যে ওয়াফাদারী বা বিশ্বস্ততার সাথে (দৃঢ়-আস্থা, অবিচল আস্থার) শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যদি ওয়াকফের প্রতিজ্ঞার সাথে সম্পৃক্ত না থাকে এবং প্রতিজ্ঞা পালন করা থেকে সরে দাঁড়ায় তাহলে তো সে নিজ রূহ্-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, জামাতের পক্ষ থেকে সে শাস্তি পেয়ে যায় বা না পায়। এটা বড়ই (মন্দ) দাগ। সুতরাং আপনি সন্তান ওয়াকফ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটি একটি বড় সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তের ফলে এ সন্তানরা হয়ত বড় মহান 'আউলীয়া আল্লাহ্' হবেন নয়ত সাধারণ অবস্থার চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে তাদের। এভাবে তাদের বিরাট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যত বড় উচ্চতা ততই বড় অধঃপতনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এজন্য খুব সাবধানে এসব সন্তানের তরবিয়ত করতে থাকুন। তাদেরকে বারবার ওয়াফাদারীর (প্রতিজ্ঞা পালনের) তরবিয়ত দিবেন। সন্তানদেরকে চালাকী, ছোট ছোট সামান্য চালাকী থেকেও রক্ষা করুন। কোন কোন সন্তান ছোটকালে চালাকী করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। পরে এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ধর্মের সাথে, জামাতের সাথে চালাকী করতে থাকে। তারপর এক সময় চালাকীর ফলে, চালাকীর তীব্রতার ফলে সে নিজ নফস্‌কে

ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। সুতরাং ওয়াকফ্ এর বিষয়টি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওয়াকফেনও সন্তানদের শিখাবেন, "আল্লাহ্‌র সাথে এটি একটি প্রতিজ্ঞা যা আমরা করেছি। বড় আন্তরিকতার সাথেই করেছি। কিন্তু তোমরা যদি এ প্রতিজ্ঞার উপর অবিচল থাকতে না পার তাহলে তোমার জন্য অনুমতি আছে- তুমি ওয়াকফ্ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সরে দাঁড়াও। একটি দরজা আছে সামনে। যখন এ সন্তানরা সাবালক, প্রাপ্তবয়স্ক হবার কাছাকাছি পৌছে যাবে তখন জামাতের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হবে, "তোমরা কি ওয়াক্‌ফের মাঝে থাকতে চাও অথবা সরে দাঁড়াতে দাও।" ওয়াকফ আসলে সেটাই যার ওপর মানুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সকল প্রকার আঘাত সহ্য করেও আঁছাড় খেয়ে পরে গিয়েও হামাগুঁড়ি দিতে দিতে এ পথে এগুতে থাকে। পেছনে ফিরে দেখে না" [জুমুআর খুতবা, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ইং]।

তারপর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, এটিও আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। বরং সবচেয়ে বড় জরুরী কথা এই যে, সন্তানদের পাঁচ বেলা নামাযের অভ্যাস করাতে হবে। কারণ যে ধর্মে ইবাদত নেই, সে ধর্ম ধর্মই নয়। সন্তানকে নামাযের অভ্যাস করাতে হবে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বিষয় পিতামাতার নমুনা। যদি তারা নিজেরা নামাযী হন তাহলে সন্তানরাও নামাযী হবে। (নমুনা ছাড়া) মৌখিক নসীহতে উপকার হয় না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেছেন, সন্তানদের জন্য তরবিয়তের প্রয়োজন আছে। হঠাৎ করে তো সন্তানরা নামাযে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে না। আঁ হযরত (সঃ) পদ্ধতি শিখিয়েছেন এই যে, সন্তানদের বয়স ৭ বছর হলে নিজের সাথে রেখে নামায পড়াতে শুরু করাতে হবে। বড় আদর দিয়ে স্নেহ দিয়ে এ কাজ করাতে হবে। কোন প্রকার কঠোরতার প্রয়োজন নেই। মারধর করার প্রয়োজন নেই। আদর-ভালবাসা দিয়ে একাজ করাতে হবে। আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। বাস্তবতা এই যে, যদি মা-বাবা নামাযী হন তাহলে তাদের সাত বছরের পূর্বেও সন্তান নামায পড়তে আরম্ভ করে দিবে। আমরা তো নিজেদের বাড়ীতে দেখেছি; নাতী-নাতনীরা খুবই ছোট বয়সে দেড় দু'বছর বয়সেই আমাদের নামাযের সাথে এসে নামাযে শামিল হয়ে যায়। নামাযীদের দেখে তাদের ভাল লাগে যে, নামাযীরা খোদার সামনে দাঁড়ায়, উঠে, আবার বসে এসব দেখে তাদের ভাল লাগে। তারাও বড়দের সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। তারা তো নামায পড়ে না বরং কেবল অনুকরণ করে। এ তো সুন্দর অনুকরণ। তবে সাত বছর বয়স হয়ে গেলে রীতিমত নামাযের তরবিয়ত দিতে হবে। তাকে ওযূ করতে শিখাতে হবে। নামাযে কীভাবে দাঁড়াতে হয়, সিজদা, বা আত্তাহিয়াতু পড়ার সময় কীভাবে বসতে হয় শিখাতে হবে।

তারপর দশ বছর বয়স পর্যন্ত আদর-যত্নে নামায শিখাতে হবে। দশ বার বছর বয়সে কিছুটা কঠোরতা প্রদর্শন করতে হবে। কারণ এটা খেলাধূলায় মগ্ন থাকার বয়স। এ বয়সে সামান্য শাস্তি বা কঠোর বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন হবে তরবিয়তের জন্য। তারপর তারা সাবালক হয়ে যাবে; বার বছরের বেশি বয়স হয়ে যাবে। তারপর আর কঠোরতার অনুমতি নেই। তার পরের ব্যাপার আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্ যা চাইবেন তা করবেন। অতএব যেমন আমি উপরে বললাম, তরবিয়তের বিষয় সাত বছর বয়স থেকে শুরু হয়ে বার বছর বা সাবালক হওয়া পর্যন্ত। তারপরেও তরবিয়তের কার্যক্রম জারী থাকে। কিন্তু সেটা ভিন্ন রং এ। একজন মানুষ তার সন্তানদের তরবিয়তের দায়িত্ব পালন করবে তাদের বয়স বার বছর তথা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত।

কিছু কিছু কথা আছে বলতে গেলে ছোট মনে হয়। কিন্তু চরিত্র গঠনের দিক থেকে সেগুলো বড় গুরুত্ব পূর্ণ কথা। যেমন খাবার গ্রহণের পদ্ধতি বা খাওযা-দাওয়ার নিয়মাবলী। এসব এমন কথা যে, মা-বাবা নিজ গৃহে ছোট বয়সে এগুলো শিখাতে পারেন। অথবা এমন স্কুল ও কলেজে যেখানে হোস্টেলের বা ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা আছে, যদি ব্যবস্থা থাকে কড়াকড়ি করে শিখাবার তাহলে সেখানে ছাত্রদের শিখানো যেতে পারে। কিন্তু এটা অনেক বড় বিষয়। তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ স্কুল-কলেজে এমন ব্যবস্থা নেই। যাহোক এটা বাপ-মার দায়িত্ব যে-সন্তানদের খানাপিনার আদব-কায়দা শিখাবেন। তবে প্রসঙ্গক্রমে আমি এখানে বলতে চাই, রাবওয়ার 'মাদ্রাসাতুল হেফয'-এ ছেলেরা পঞ্চম শ্রেণী পাশ করে এসে ভর্তি হয়। (কুরআন হেফ্‌য/মুখস্ত করার স্কুল) আমি সেখানে দেখেছি ছেলেদের খুব ভালভাবে তরবিয়ত দেয়া হয়। খুব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাদের নেগরানী করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, গ্রাম, শহর এবং বিভিন্ন পরিবার থেকে ছেলেরা আসে। খুব ভাল তরবিয়ত দেয়া হয়। তাদের চরিত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে। তারা কুরআন মুখস্থ করে। সাথে সাথে তরবিয়তও দেয়া হয়। এত সুন্দর করে বসে তারা খাবার খায় যে, দেখতে চমৎকার লাগে। অথচ সেই বয়সের ছেলেরা-[চঞ্চল হওয়া স্বাভাবিক] তারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী খাওয়ার টেবিলে কেমন সুন্দর আচরণ করছে। যেমন, 'বিসমিল্লাহ্' বলে খাওয়া আরম্ভ করা, নিজের সামনে থেকে খাদ্য গ্রহণ করা, নিজ প্লেটে এতটা খাবার তুলে নেয়া যতটুকু সে খাবে। প্রয়োজনে আবার নিবে। ডান হাতে খাওয়া ইত্যাদি। খাবার পরে দোয়া করা। এ ধরনের ছোট ছোট বিষয় ছোট ছেলে-মেয়েদের সকলকে শিখানো উচিত। বিশেষ করে ওয়াকফে নওদের সাধারণভাবে সকলের শিখা উচিত। আমি মাদ্রাসাতুল হেফয-এর উদাহরণ দিয়েছি।

আল্লাহ্ করুন পরবর্তিতেও যেন জারী থাকে। পিতামাতারাও এ ভাবেই সন্তানদের তরবিয়ত দিবেন।

অনেক সন্তান খাওয়ার পর হাত না ধুয়েই উঠে যায়। পিতা-মাতারা খেয়াল করেন না। সেই ময়লা হাতে তারা অন্যান্য জিনিসপত্রে হাত দেয়। এদের স্নেহের সাথে বুঝাতে হবে। অনুরূপভাবে ছোট ছোট অনেক অভ্যাস ছোট বয়সেই বদ অভ্যাস হতে না দিয়ে ভাল অভ্যাস গড়ে তোলা যায়। সব মিলিয়ে পরবর্তীতে উত্তম চরিত্র গঠিত হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) শিশু সন্তানদের উত্তম চরিত্র গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"প্রত্যেক ওয়াকফে নও শিশুর মাঝে বাল্যকাল থেকেই সত্যের প্রতি ভালবাসা এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে।

মিথ্যার প্রতি ঘৃণা যেমন তার মায়ের দুধের সাথে মিশিয়ে পান করাতে হবে। যেমন রেডিয়েশন (আলোক রশ্মি) কোন কিছুর মাঝে প্রবেশ করে যায়- তেমনই বাবার তরবিয়তের বাহুর মাধ্যমে শিশুর হৃদয় যেন সত্যের মাঝে সাঁতার কাটে। এর অর্থ এই যে, মা বাবাকে পূর্বের তুলনায় এখন অনেক বেশি সত্যবাদী সত্যভাষী হতে হবে। ওয়াকফে নওদের পিতামাতারা এ কথা নোট করবেন, **তাদেরকে আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি সত্যবাদী হতে হবে। এমন তো নাও হতে পারে যে, সকল ওয়াকফে নও মা বাবারা আগে থেকে সত্যবাদী। তারা অতি উঁচু স্তরে অবস্থান করছেন, যা উচ্চ স্তরের মু'মিনদের জন্য আবশ্যক হয়।** সুতরাং এখন তাদেরকে এসব সন্তানদের খাতিরে নিজেদের তরবিয়তের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি সাবধানতার সাথে নিজ বাসস্থানে কথা-বার্তা বলতে হবে। অসাবধানতাবশতঃ যেন কোন অযথা কথা মুখে না এসে যায়। হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়েও যেন মিথ্যা বলা না হয়। কারণ আল্লাহ্‌র পবিত্র আমানত আপনাদের কোলে বড় হচ্ছে। এসব পবিত্র আমানতের প্রতি [আপনার হাতে আল্লাহ্‌র গচ্ছিত ধন-অনুবাদক] আপনার অনেক কিছু কর্তব্য রয়েছে। এ সমস্ত কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হবে আপনাকে। সুতরাং এ সমস্ত গৃহের পরিবেশ পরিস্থিতি সত্যতার দিক থেকে অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পবিত্র রাখতে হবে।

তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) আরো বলেছেন, "আমি মিতব্যয়িতা সম্পর্কে বলেছিলাম, ওয়াকফীনদের সাথে মিতব্যয়িতা বা স্বল্প-ব্যয় বা কৃচ্ছ্রতার বড় গভীর সম্পর্ক। এমন শিশু সন্তানদেরকে মিতব্যয়ী হওয়ার অভ্যাস গড়তে হবে। লোভ-লালসার থেকে বহু দূরত্ব সৃষ্টি করতে হবে। বুদ্ধিমত্তা ও বিবেক দিয়ে পিতা-মাতারা যদি ছোট কালে এদের তরবিয়ত করতে থাকেন, তাহলে এদের জন্য এমন হওয়া বড় কঠিন নয়। অতএব এদেরকে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার অতি উচ্চ শিক্ষা দেয়া একান্ত আবশ্যক।"

তারপর মনে রাখতে হবে যে, এরা যেন সদাচারী হয়। হাস্যোজ্জ্বল মুখ আনন্দময় মেজায হয়। কঠোর স্বভাব, কঠোর মেজায, মুখ ভার মানুষ ওয়াকফে জিন্দিগী হয়ে চলা সম্ভব নয়। তিক্ত মেজায ওয়াকফে জিন্দিগীরা সব সময় জামাতের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। কখনও কখনও বড় ফেৎনা সৃষ্টি করে দেয়। সুতরাং সুষমস্বভাব, ভালস্বভাব এর সাথে ধর্মেরও প্রয়োজন। যে কোন কথাকে যেন সহ্য করতে পারে। এ দু'টি স্বভাব ওয়াকফে জিন্দিগীর জন্য একান্ত আবশ্যক।

তাছাড়া ওয়াকফে জিন্দিগী সন্তানদের কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস থাকতে হবে। জামাতী নেযামের আনুগত্যের অভ্যাস থাকতে হবে। ছোট বয়সে মজলিস আতাফালুল আহমদীয়ায় শামিল হতে হবে। কন্যারা নাসেরাতুল আহমদীয়ায় শামিল হবে। আতফালরা বড় হয়ে খোদ্দামুল আহমদীয়ায় শামিল হবে" (জুমুআর খুতবা; ১০ জানুয়ারী, ১৯৮৯ইং)।

কোন কোন ক্ষেত্রে মনে করা হয়েছে যে, ওয়াকফে নওরা পৃথক কোন সংগঠনের সদস্য। অথচ ওয়াকফে নওরা পৃথক নয় বরং জামাতের সংগঠনগুলোরও অন্তর্ভুক্ত।

অল্প বয়সেই তাদের মাঝে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার প্রতি নজর দিতে হবে। হযরত খলীফা রাবে' (রাহেঃ) বলেছেন, আমি হুযূর (রাহেঃ)-এর উদ্ধৃতি এ জন্য দিচ্ছি যে, এটি একটি অনেক বড় আন্দোলন (তাহ্‌রীক) যা হুযূর রাবে' (রাহেঃ) জারী করেছেন] এর সুফল এখন আস্তে আস্তে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে আপনারা দেখবেন, কত ব্যাপক কত সুদূর প্রসারী সুফল সৃষ্টি হয়েছে, ইনশাআল্লাহ্!

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেছেন,

বাল্যকাল থেকেই এদের মাঝে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। আসল কথা এই যে, দেরী হয়ে গেলে পরে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। প্রবাদ আছে যে, লোহা যখন গরম থাকে তখন একে যে কোন আকৃতি দেয়া যায়। কিন্তু বাল্যকালের শিশুদের অনেক দিন পর্যন্ত আল্লাহ্ নরম রাখেন। এমন নরম অবস্থায় এদের মাঝে যেমন ইচ্ছা রেখা অঙ্কন করা যায় এবং পরে সেই রেখা স্থায়ী হয়ে যায়। অতএব আজ এদের তরবিয়তের সময়। তরবিয়তের বিষয়ে স্মরণ রাখা দরকার যে, পিতামাতারা মৌখিক যত খুশী তরবিয়ত করুন, কিন্তু যদি তাদের কথায় ও কাজে মিল না থাকে তাহলে সন্তানরা দুর্বল দিকগুলো গ্রহণ করবে এবং কঠিন দিকগুলোকে ছেড়ে দিবে। এখানে পিতামাতার জন্য চিন্তার কারণ। এ দু' প্রজন্মের পরস্পর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন একটি জরুরী নীতি যা ভুলে গেলে জাতির জীবনে ধ্বংস নেমে আসতে পারে এবং নীতি স্মরণ রাখলে জাতির উন্নতি হতে পারে। একটি প্রজন্ম যখন পরবর্তী প্রজন্মের উপর প্রভাব ফেলে তখন এ নীতিই সেখানে ক্রিয়াশীল হয় যে, সন্তানরা বাবা-মা'র দুর্বল দিকগুলো খুব দ্রুত কবুল করে এবং ভাল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। কথা যদি বড় উন্নত চরিত্রেরও হয় কিন্তু তার ভেতরে যদি দুর্বলতা লুকিয়ে থাকে তাহলে সন্তানরা ভেতরের দুর্বল কথাকে গ্রহণ করবে। সুতরাং আপনারা স্মরণ রাখবেন, সন্তানদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে অবশ্যই আপনাদের নিজেদের তরবিয়ত করতে হবে।

আপনি ওয়াকফে নও সন্তানদের একথা বলতে পারেন না যে, 'তোমরা সত্যবাদী হও কারণ তোমরা মোবাল্লেগ হবে; তোমরা অসৎ হয়ো না কারণ তোমরা মোবাল্লেগ হবে; তোমরা কুৎসা করো না কারণ তোমরা মোবাল্লেগ হবে; তোমরা ঝগড়া-ঝাটি করো না কারণ তোমরা মোবাল্লেগ হবে। এসব কথা বলে তারপর মা-বাবা ঝগড়া আরম্ভ করে দিবে, অশ্রাব্য ভাষায় বকবে, একে অপরের বেইয্যতি করতে থাকবে আর বলবে যে, সন্তানদের তো উপদেশ দিয়ে দিয়েছি! এখন আমরা আমাদের মত ঘর সংসার করছি! এ হতে পারে না। যা তাদের নিজেদের জীবন, তাদের সন্তানদের জীবনও তো তা-ই হবে। তারা যে কল্পনার জীবন বানিয়ে দেখাচ্ছেন যে, এমন কর তেমন কর; সন্তানরা মোটেই তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। এমন বাবা-মা যারা মিথ্যাচার করে কিন্তু সন্তানকে বলে যে, মিথ্যা বলো না। লক্ষ বার বললেও কাজ হবে না (একথা শুনে) বড় কষ্ট হয়। তোমরা খোদার খাতিরে সত্যবাদী হও। সত্যবাদিতার মাঝে জীবন আছে। সন্তানরা বলবে, সত্য বলা ভাল কথা। কিন্তু সে তো ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারে যে,

মা-বাবা মিথ্যাবাদী। তাই সে অবশ্যই মিথ্যা বলতে শিখে। সুতরাং নতুন প্রজন্মের মিলনের সময় এ নীতিই ক্রিয়াশীল হয়। এ নীতিকে ভুলে গেলে উভয়ের মাঝে শূন্যতা সৃষ্টি হয়" [জুমুআর খুতবা; ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯]।

উপরোক্ত আলোচনার পর পিতামাতারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চয় অবগত হয়েছেন যে, সন্তানদের তরবিয়তের জন্য নিজেদের তরবিয়তের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে।

তারপর উপরে যেমন আমি হযরত খলীফা রাবে' (রাহেঃ)-এর ভাষায় বলেছি যে, ঘরের পরিবেশ এত সুন্দর, স্নিগ্ধ ও ভালবাসাময় বানাতে হবে যেন সন্তানরা অতিরিক্ত সময় নিজ গৃহে বাবা-মা'র সঙ্গে কাটাতে চায়, বাইরে সময় কাটাতে না চায়। গৃহের পরিবেশ এমন বন্ধু-সুলভ হওয়া চাই যে, সন্তানরা বাবা-মা'র সাথে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে। প্রশ্ন করতে পারে। শালীনতার মাঝে থেকে সকল প্রকার আলোচনা করতে পারে। এর জন্য বাবা-মাকে অবশ্যই কুরবানী করতে হবে। তারা নিজ খোদার সাথে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তাদেরকে কুরবানী দিতে হবে। আপনারা পূর্বেও শুনেছেন, হুযূর রাবে' (রাহেঃ) নসীহত করেছেন, মা-বাবাকে আমিও বলছি, অনেক সময় মা-বাবাকে নিজের কিছু অধিকার, কিছু পাওনা ছেড়ে দিতে হবে। অথচ অনেক সময় তারা পাওনা ছেড়ে দেয়া তো দূরের কথা (সন্তানদের পাওনার থেকে) আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেন। আবার তারা চান যে, তারা যেহেতু সন্তান ওয়াকফ করেছেন তাই তারা যদি কোন ভুলও করেন যেন তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করা হয়। এটা কি করে সম্ভব?

তারপর আবার সুস্পষ্ট করে বলছি, যে কোন প্রকার মন্দকর্ম তখনই অন্তরে স্থান লাভ করে যখন সেই মন্দকর্মের মন্দ বা ভাল হওয়ার পার্থক্য থাকে না। অনেক সময় মানুষ নেকী প্রকাশ করতে থাকে নামাযও পড়তে থাকে, মসজিদে যাতায়াত করে, মানুষের সাথে ভাল আচরণ করে, কিন্তু নেযামে জামাতের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সামান্য অভিযোগ সৃষ্টি হয় অথবা কোন সিদ্ধান্ত তার পসন্দ মত না হয়, তখন জামাতের সেই পদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তার মনে রাগ জন্ম নেয়। তারপর সেই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রাগের কারণে নেযামে জামাতের বিরুদ্ধে কোথাও ছোট খাট বাক্যবাণ ছেড়ে দেয়। তারপর নিজ গৃহে স্ত্রীর সাথে অথবা সন্তানদের সামনে, আত্মীয়-স্বজনের সামনে কোন বাক্য ব্যয় করে। এভাবে সমাজে এবং সন্তানের মনে নেযামে জামাতের সম্মান ক্ষুণ্ন হতে থাকে। সুতরাং নেযামে জামাতের সম্মান কায়েম রাখতে খুবই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ভাষায় আপনাদের সামনে রাখছি।

"(ওয়াকফে নও সন্তানদেরকে) নেযামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন শিখাতে হবে। আমাদের গৃহে কখনও এমন কথা বলা উচিত নয় যাতে করে নেযামে জামাতের অসম্মান হয়, অথবা পদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে। যদি সেই অভিযোগ সত্যও হয়ে থাকে তবুও ঘরে সেসব কথা আলোচনা হওয়া উচিত নয়। নতুবা আপনাদের সন্তানরা চিরদিনের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। আপনি তো অভিযোগ সত্ত্বেও নিজের ঈমানকে রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু আপনার সন্তানরা অনেক বেশি আহত ও গভীরভাবে আহত হয়ে যাবে। এ আঘাত এমন যে, যারা আহত হয় তারা কম ব্যথা পায় কিন্তু যারা কাছ থেকে দেখে তারা বেশি ব্যথা পায়। এ জন্য যারা নেযামের বিরুদ্ধে কথা বলে, অসাবধান হয়ে সমালোচনা করে তাদের সন্তানরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, অবশ্যই অল্প-বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেকে চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে।

ওয়াকফে নও সন্তানদের বুঝাতে হবে যে, যদি কারো বিরুদ্ধে তোমার মনে অভিযোগ সৃষ্টি হয়, তার সম্বন্ধে তোমার আশা-আকাঙ্খা যত উচ্চই হোক না কেন, সেই অভিযোগের কারণে তোমার নিজ নফস্‌কে (নিজকে) নষ্ট হতে দিবে না, যার ফলে আল্লাহ্‌র জামাতের ক্ষতি হতে পারে!

আপনি যদি কারো কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন বা কেউ আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকে; এর অর্থ এই নয় যে, আপনার অধিকার হয়ে গেছে, আপনি এখন নিজ পরিমন্ডলে, নিজ পরিবেশে নিজ বন্ধুবান্ধবদের, নিজ সন্তানদের ঈমানকে আহত করতে শুরু করবেন। আপনার জখম, আপনার কষ্ট আপনি নিজের মাঝেই রাখুন। আপনার ক্ষতি বা আপনার কষ্ট নিরসনের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা রাখা আছে তা অবলম্বন করুন" [জুমুআর খুতবা; ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ইং]।

তারপর একটি সাধারণ বিষয় আছে এদিকে পিতামাতাকে নজর দিতে হবে; তাহ'ল এই যে, সন্তানদের মাঝে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি করতে হবে। এদেরকে মুত্তাকী বানাতে হবে। যতদিন পিতামাতা মুত্তাকী না হবেন, ততদিন একাজ সম্ভব হবে না। অথবা মুত্তাকী হতে সচেষ্ট হতে হবে কমপক্ষে। কারণ যতক্ষণ আমল করবেন না মুখের কথায় কাজ হবে না। সন্তানরা দেখছে যে, মা-বাবা প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করছেন না, তাদের অধিকার দিচ্ছেন না, নিজ ভাইবোনের অধিকার তাদের না দিয়ে নিজেরা আত্মসাৎ করছেন। সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে মা-বাবার মাঝে ঝগড়া হচ্ছে, মতভেদ হচ্ছে- এমতাবস্থায় সন্তানদের তরবিয়ত হবে তাদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি হবে এটা খুব কঠিন। সুতরাং সন্তানদের তরবিয়তের খাতিরে হলেও মা-বাবাকে নিজের তরবিয়ত করতে হবে। এ সম্পর্ক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেছেন, "ওয়াকফে নও সন্তানদেরকে বাল্যকাল থেকেই মুত্তাকী বানাতে হবে। তাদের জন্য তাদের পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন না যার ফলে তাদের অন্তর ধর্মের দিক থেকে সরে গিয়ে পার্থিব জগতের প্রতি ঝুঁকে যেতে পারে। তাদের প্রতি পুরোপুরি নজর দিন। যেমন কোন প্রিয় বস্তুকে বড় উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুত করা হয়। তাদের অন্তর যেন এভাবে তাকওয়ায় ভরে যায় যেমন তারা আপনার হাতে না খেলে আল্লাহ্‌তাআলার হাতে খেলতে শুরু করে দেয়। যেমন একটি জিনিস কারো হাতে দিয়ে দেয়া হয়, সোপর্দ করে দেয়া হয়, অনুরূপভাবে, তাকওয়া এমন একটি জিনিস যদ্বারা আপনারা শুরুতেই সন্তানকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করে দিতে পারেন। মাঝখানের সকল মাধ্যম, সকল অবলম্বন

সরে যাবে। নিয়ম বা বিধান মতে তারা তাহ্‌রীকে জাদীদের ব্যবস্থার মাঝে তথা ওকালতে ওয়াকফে নও এর মাঝে থাকবে, জামাতী নেযামের মাঝে থাকবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে (আধ্যাত্মিকভাবে) যারা বাল্যকাল থেকেই আল্লাহ্‌তাআলার কোলে বসে আদর পেতে থাকে, পরবর্তীতেও আল্লাহ্‌ই তাদের দেখা -শোনা করেন। তিনি স্বয়ং এদের জন্য সব ব্যবস্থা নিবেন। তিনি স্বয়ং তাদের নেগরানী করবেন। যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দেখা-শোনা করেছিলেন। হযরত আকদস (আঃ) লিখেছেন,

'প্রথম থেকেই তোমার ছায়ায় আমার দিন কেটেছে। তোমার কোলে আমি দুগ্ধপানকারী শিশুর মত ছিলাম।' সুতরাং একটি মাত্র পথ, কেবলই একটি মাত্র পথ এই যে, আমরা নিজেদেরকে, নিজেদের ওয়াকফে নওদেরকে যেন আল্লাহ্‌তাআলার কাছে সোপর্দ করে দিই; এবং তারা আল্লাহ্‌র হাতে খেলতে থাকুক" (জুমুআর খুতবা; ১লা ডিসেম্বর, ১৯৮৯ইং)।

তারপর সন্তানদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করে দিন যে, "আমরা ওয়াকফে যিন্দিগী (উৎসর্গকৃত জীবন)। আজকের জগতে এর চেয়ে বড় আর কিছু নেই।" তারপর তাদের মাঝে মিতব্যয়িতা সৃষ্টি করা; পুণ্যের ব্যাপারে তোমরা নিজের চেয়ে বড়দের দিকে দৃষ্টি দাও এবং আরো উপরে উঠতে চেষ্টা কর। কিন্তু পার্থিব ধন-সম্পদের ব্যাপারে অথবা ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে। বরং এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের চেয়ে যারা গরীব তাদের দিকে দেখ এবং খুশী অনুভব কর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধর্মের সেবার সুযোগ দিয়েছেন এবং ধর্মের সেবার সম্পদে সম্পদশালী করেছেন। কারো কাছে কিছু আশা করবে না। প্রত্যেকটি জিনিস নিজ খোদার কাছে চাও। ওয়াকফে নওদের একটি বড় সংখ্যা এখন সাবালক হয়েছে, মাশাআল্লাহ্। তারা নিজেরাই এখন আমার এ সমস্ত কথার প্রতি দৃষ্টি দিতে পারবে।

প্রসঙ্গক্রমে আমি একথাও বলে দিচ্ছি, হযরত খলীফা রাবে' (রাহেঃ) একবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন যে, ওয়াকফে নওদের মাঝে অনেক বড় সংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাদের তরবিয়ত এভাবে করা হয় যেন তাদের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হয় যে, তারা মুরব্বী / মুবাল্লেগ হবে। আগামীতে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে যে, অনেক বেশি সংখ্যায় মুবাল্লেগের প্রয়োজন হবে। সুতরাং এমনভাবে তরবিয়ত করবেন যেন, অধিকাংশদের জানা থাকে যে, তারা তবলীগের মাঠে নামবে। এ কথা স্মরণ রেখে তরবিয়ত হওয়া উচিত।

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পড়ে শোনাচ্ছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করা, যা প্রকৃত ইসলাম অনুযায়ী দু' প্রকারে হয়। এক এই যে, কেবল আল্লাহ্‌তাআলাকে ইবাদতের যোগ্য মনে করা; জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করা; প্রিয়তম মনে করা এবং এমনভাবে তাঁর ইবাদত করা, এমন ভালবাসা এবং ভয় ও আশা নিয়ে যাতে অন্য কেউ শরীক না হয়। আল্লাহ্‌র বুযুর্গী ও পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং ইবাদত করা। ইবাদতের নিয়মাবলী রীতি-নীতি পালন করা, আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও আদেশসমূহ এবং নির্ধারিত সীমারেখার মাঝে নিজেকে আবদ্ধ রাখা, ঐশী তকদীর ও সিদ্ধান্তসমূহকে আন্তরিকভাবে কবুল করা। অত্যন্ত নীচু হয়ে বিনয়ের সাথে সকল আদেশ-নির্দেশ মান্য করা; সীমা রেখাকে রক্ষা করা, সমস্ত বিধিবিধান ও তকদীরকে পূর্ণ আনুগত্য ও আন্তরিকতার সাথে শিরোধার্য করে নেয়া। অধিকন্তু, সেই সমস্ত পবিত্র সত্য এবং পবিত্র ঐশী-জ্ঞান যা তাঁর বিশাল শান্তির পরিচয়ের উপায় এবং তার বিশাল রাজত্ব ও রাজ্যের উচ্চ মর্যাদাকে জানবার জন্য একটি মাধ্যম এবং এর জন্য যন্ত্রস্বরূপ এবং তাঁর নেয়ামতসমূহকে চিনবার জন্য একটি শক্তিশালী নির্দেশক (যদ্বারা) খুব সহজে জেনে নেয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন ওয়াকফ করা এই যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের খেদমত করা, তাদের সাথে মর্মবেদনা প্রদর্শন করা, তাদের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তাদের বোঝা বহন করা এবং প্রকৃত অর্থে তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে জীবন উৎসর্গ করা উচিত। অন্যদেরকে আরাম দিতে নিজে কষ্ট স্বীকার করা উচিত। অন্যদেরকে স্বস্তি দিতে নিজে কষ্ট স্বীকার করা" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন; ৫ম খন্ড, পৃঃ ৬০)।

অন্য জায়গায় হযরত আকদস (আঃ) লিখেছেন,

"মুসলমান সে, যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করে দেয়। অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মাঝে বিলীন করে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে। তারপর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্মে নিযুক্ত হয়ে যায় এবং নিজের সমস্ত শক্তিকে সমস্ত কর্মকান্ডকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিয়োগ করে। সারাংশ এই যে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং নিজের আমল দিয়ে কার্যকরভাবে আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গী হয়ে যাওয়া।

বিশ্বাসের দিক থেকে এভাবে যে, নিজেকে এমন একটি বস্তু মনে করা যাকে আল্লাহ্‌র পরিচয় তাঁর আনুগত্য তাঁর প্রেম ও ভালবাসায় ডুবে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আসল বা বাস্তবে এভাবে যে, প্রত্যেক সৎকর্ম যা আল্লাহ্‌প্রদত্ত শক্তি - সামর্থ্য দিয়ে সম্পাদন করা হয়, তা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র জন্য যেন করা হয়। কিন্তু এত বেশি আন্তরিকতা দিয়ে, আগ্রহ ও উদ্যোগ নিয়ে করা যেমন নিজ আনুগত্যের আয়নার মাঝে প্রকৃত মা'বূদকে সে দেখতে পাচ্ছে" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৫৭-৫৮)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আমি আমার জামাতকে ওসীয়্যত বা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় উপদেশ দেয়া আমার ফরয মনে করছি, এ কথা প্রত্যেককে জানিয়ে দেয়া ফরয মনে করছি যে, "আগামীতে প্রত্যেকের জন্য সুযোগ আছে, সে চাইলে শুনতে পারে অথবা না-ও শুনতে পারে যে, যদি কেউ নাজাত (মুক্তি) পেতে চায়; যদি পবিত্র জীবন; অমর জীবন লাভ করতে চায় তবে তার উচিত হবে আল্লাহ্‌র জন্য নিজেকে ওয়াক্‌ফ করা (উৎসর্গ করা)। তারপর প্রত্যেক প্রকারের চেষ্টা ও চিন্তা-মগ্ন হবে যেন এ মর্যাদা লাভ করে, এ অবস্থান

লাভ করতে পারে যেখানে সে বলতে পারে যে, "আমার জীবন, আমার মরণ, আমার সকল কুরবানী, আমার সমস্ত নামায একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য"। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মত রূহ যেন বলে উঠে, **আসলামতু লি রব্বিল আলামীন**, আমি রব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ্‌র মাঝে নিজে বিলীন; বিলুপ্ত হয়ে না যায়; আল্লাহ্‌র মাঝে গিয়ে ডুবে না মরে ততক্ষণ সে নব জীবন লাভ করতে পারে না।

সুতরাং তোমরা যারা আমার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছ, তোমরা দেখছ যে, আমি আল্লাহ্‌র জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে মনে করি। এবার তোমরা দেখ তোমাদের মাঝে তোমরা কতজন আছ যারা আমার এ কর্মকে নিজের জন্যও পসন্দ কর এবং খোদাতাআলার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে ভালবাস" (আল্ হাকাম, পৃঃ ৪, ৩১ আগষ্ট, ১৯০০ইং)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"সবচেয়ে নিরাপদ ও নিশ্চিত হওয়ার পথ একটিই। আর তা এই যে, মানুষ যেন নিজের উদ্দেশ্যকে পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে এবং পুরোপুরি আল্লাহ্‌র দিকে ধাবমান হয়। আল্লাহ্‌র সাথে নিজ সম্পর্কে পরিষ্কার করে এবং সমৃদ্ধ করে। আল্লাহ্‌র সত্তার দিকে দৌড়ে যায়। তিনিই যেন তার সঠিক গন্তব্যস্থল এবং প্রিয়তম হন এবং তাকওয়ার উপরে দাঁড়িয়ে সৎকর্ম করে। তারপর আল্লাহ্‌র বিধান ক্রিয়াশীল হবে। তার দৃষ্টি যেন ফলাফলের দিকে না হয়। বরং তার দৃষ্টি তো কেবল সেই একই বিন্দুর উপর নিবদ্ধ থাকবে। এ পর্যন্ত পৌছার জন্য যদি শর্ত দেয়া হয় যে, সেখানে গিয়ে সবচেয়ে বেশি তার শাস্তি হবে- তবুও তাঁরই প্রতি অগ্রসর হও। অর্থাৎ তাঁর পানে ধাবিত হওয়া উদ্দেশ্য, যেন আযাব বা পুরস্কার না হয়। বরং তার শর্ত ও উদ্দেশ্য যেন কেবল মাত্র আল্লাহ্‌কে পাওয়া হয়। যখন কেউ বিশ্বস্ততার সাথে, নিষ্ঠার সাথে, আন্তরিকতার সাথে তাঁর দিকে চলে তখন সে তাঁর নৈকট্য লাভ করবে। তখন সে সেসব কিছু দেখবে যা সে কখনও কল্পনাও করে নি। কাশ্‌ফ বা স্বপ্ন তো কোন কিছু বলে মনে হবে না। সুতরাং আমি তো তোমাদেরকে সেই পথে চালাতে চাই এবং এটাই আসল উদ্দেশ্য"

(আল্ ফযল লন্ডন; ২২ আগস্ট, ২০০৩ইং-এর সৌজন্যে)

অনুবাদ ঃ **মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম ও মাহ্‌দী (আঃ)

(১২তম কিস্তি)

অতএব প্রকৃত সত্য হলো, মসীহ্ যেহেতু জানতেন, তিনি ক্রুশ থেকে রক্ষা পেয়ে অন্য দেশে চলে যাবেন এবং যতক্ষণ তিনি ইহুদীদের ধ্বংস নিজ চোখে না দেখে নেন ততক্ষণ দুনিয়া থেকেও খোদা তাকে তুলে নিবেন না। এবং যতক্ষণ মনোনীত বান্দাদের ন্যায় তাঁর জন্যও আসমানে নির্ধারিত (রূহানী) রাজত্ব নিজ ফলাফল দেখিয়ে না দেয়, ততক্ষণ তিনি মারাও যাবেন না, সেহেতু হযরত মসীহ্ তাঁর শিষ্যদেরকে স্বস্তি প্রদানের জন্য এ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, অচিরেই তারা তাঁর এ নিদর্শন দেখতে পাবে, যারা তাঁর ওপর তলোয়ার তুলেছে তাদেরকে তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর সম্মুখে তলোয়ার দ্বারাই হত্যা করা হবে। অতএব কোন বিষয়ের প্রমাণ যদি আবশ্যকীয় ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে খৃষ্টানদের জন্য এর চেয়ে অধিকতর প্রমাণ অন্য কিছু নেই যে, মসীহ্ নিজ মুখে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'তোমাদের কেউ কেউ জীবিত থাকতেই আমি আবার আসবো।'

মনে রাখা আবশ্যক, ইঞ্জিলে হযরত মসীহ্‌র আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে ঃ (এক) শেষ যুগে তাঁর আগমনের যে ওয়াদা ঃ তা হচ্ছে রূহানীভাবে আগমনের ওয়াদা এ আগমন সে প্রকারেরই আগমন, যে প্রকারে এলিয় (ইয়াহ্‌ইয়া) নবী মসীহ্‌র সময়ে পুনরায় এসেছিলেন। সুতরাং তিনি (মসীহ্) আমাদের এ যুগে এলিয়র ন্যায় আবির্ভূত হয়েছেন। আর এ লেখকই হলো সেই মসীহ্-মানবজাতির খাদিম (সেবক), যে মসীহ্ আলায়হিস্ সালামের নামে 'মসীহ্ মাওউদ' (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্) হয়ে এসেছে। হযরত মসীহ্ আমার সম্পর্কে ইঞ্জিলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব মুবারক (ধন্য) সেই ব্যক্তি, যে মসীহ্ (আঃ)-কে সম্মান দেয়ার জন্য আমার সম্বন্ধে সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়-পরায়ণতার সাথে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং পদস্খলিত না হয়।

(দুই) মসীহ্‌র পুনরায় আগমন সম্পর্কে ইঞ্জিলে দ্বিতীয় প্রকারের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায় তা প্রকৃতপক্ষে মসীহ্‌র সেই জীবন প্রদান করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যা মসীহ্‌র ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর খোদাতাআলার অনুগ্রহে কায়েম ও বহাল থাকে এবং ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে খোদা নিজ মনোনীত বান্দাকে রক্ষা করেন-যেমন, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি যা এখনই বর্ণনা করা হলো। খৃষ্টানদের এটা ভুল, তারা এ দু'টি পৃথক প্রসঙ্গকে একটির সাথে আরেকটি মিলিয়ে ফেলেন। আর এ কারণেই তারা বড়ই বিভ্রাট ও নানা সংকটের মুখোমুখি হয়ে থাকেন। মোটকথা, মথির ২য় অধ্যায়ের এ শ্লোকটি হযরত মসীহ্‌র ক্রুশ থেকে বেঁচে যাওয়ার স্বপক্ষে বড় একটি প্রমাণ।

ইঞ্জিলে যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা দেখতে পাই সেগুলোর আরেকটি হলো মথির নিম্নরূপ শ্লোক ঃ 'আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাবে। আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী, সকল জাতি বিলাপ করবে এবং মনুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘ রথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসতে দেখবে (মথি ২৪ ঃ ৩০)।

এ শ্লোকগুলোর প্রকৃত মর্ম হলো, হযরত ঈসা (আঃ) বলছেন, এমন এক যুগ আসবে যখন আকাশ থেকে অর্থাৎ নিছক খোদার কুদরত ও পরাক্রমে এমন সব জ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষী-সাবুদ উদ্ভাবিত হয়ে যাবে, যা মসীহ্‌র ঈশ্বরত্ব বা ক্রুশে মৃত্যুবরণ ও আকাশে গমন এবং পুনরাগমন সংক্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের অসারতা ও বাতিল হওয়া প্রমাণ করে দেবে, আর যেসব জাতি তাঁকে

সত্য নবী বলে স্বীকার করতো না, বরং তাঁকে ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়ার কারণে অভিশপ্ত মনে করতো, যেমন ইহুদীরা-তাদের মিথ্যার বিরুদ্ধেও আকাশ সাক্ষ্য দেবে। কেননা ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে তিনি নিহত হন নি, কাজেই অভিশপ্তও হন নি-এ প্রকৃত সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন পৃথিবীর সেই সকল জাতি ও গোষ্ঠী যারা তাঁর মর্যাদা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা এর অবমূল্যায়ন করেছিল তারা সবাই বিলাপ করবে ও নিজেদের ভুলের কারণে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। আর সে যুগেই প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হলে মানুষ রূহানীভাবে মসীহ্‌কে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে দেখবে অর্থাৎ সে সময়েই 'মসীহে মাওউদ' হযরত ঈসার শক্তি ও স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আবির্ভূত হবেন আর স্বর্গীয় সাহায্য সমর্থনে ও ঐশী পরাক্রম ও মহা প্রতাপে অভিসিক্ত হয়ে নিজ সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণসহ প্রকাশিত হবেন এবং মানুষ তাঁকে চিনতে ও জানতে পারবে। এ শ্লোক বা আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, খোদাতাআলার নিয়তির বিধানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যক্তি-সত্তা এমনই ছাঁচে তৈরী হয়েছে এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলীও এমন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে যে, কোন কোন জাতি তাঁর সম্পর্কে মর্যাদা নির্ণয়ে অতিরঞ্জন করেছে আর কোন কোন জাতি তাঁর মর্যাদার অবমূল্যায়নের পথ অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ একটি হলো সেই জাতি, যারা তাঁকে মানব শ্রেণীর উর্ধে নিয়ে গেছে। এমন কি, তারা বলে, এখনও তিনি মারা যান নি এবং আকাশে জীবিতাবস্থায় রয়েছেন। তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে সেই জাতি, যারা বলে, ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান; তারপর আবার জীবিত হয়ে আকাশে চলে যান এবং খোদায়ী বা ঈশ্বরত্বের সকল ক্ষমতা তিনি পেয়ে গেছেন, বরং তিনি নিজেই স্বয়ং খোদা। অন্য জাতি হলো ইহুদী। তারা বলে, তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ কারণে নাউযুবিল্লাহ্ তিনি চিরস্থায়ীভাবে অভিশপ্ত ও ঐশীক্রোধগ্রস্ত হন - খোদা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্টি ও শত্রুতার দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেন। তিনি মিথ্যাবাদী, মিথ্যারোপকারী এবং নাউযুবিল্লাহ্ কাফির ও মুলহিদ। তিনি তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি নন। অতএব মর্যাদার এ অতিরঞ্জন ও অবমূল্যায়ন ছিল অন্যায়-অবিচারপূর্ণ এমন পন্থা, যদ্দরুন খোদাতাআলার পক্ষে তাঁর সত্য নবীকে এসব অভিযোগ অপবাদ থেকে মুক্ত করা আবশ্যক ছিল। কাজেই ইঞ্জিলের এ কথার দিকেই আয়াতের ইঙ্গিত রয়েছে। আর 'পৃথিবীর সকল জাতি ও গোষ্ঠী বিলাপ করবে' - এর দ্বারা এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেসব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে জাতি শব্দের প্রয়োগ হতে পারে তারা সেদিন বিলাপ করবে আর তাদের বিলাপ খুব কঠিন হবে। এক্ষেত্রে খৃষ্টানদের একটু গভীর মনোনিবেশে এ আয়াত বা শ্লোকটি পড়া ও চিন্তা করা উচিত, এতে যেহেতু সকল জাতি ও গোষ্ঠীর বিলাপ করা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেহেতু খৃষ্টান জাতি কী করে এ বিলাপের আওতার বাইরে থাকতে পারে? তারা কি জাতি নয়? আর তারাও যখন ও আয়াত অনুযায়ী বিলাপকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তখন তারা আবার কেন নিজেদের 'নাজাত' বা পরিত্রাণের বিষয়ে চিন্তা করেন না? এ আয়াতটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মসীহ্‌র নিদর্শন যখন আকাশে প্রকাশিত হতে দেখা যাবে, তখন ভূ-পৃষ্ঠের সকল জাতি বিলাপ করবে। অতএব যে ব্যক্তি বলে, 'আমাদের জাতি বিলাপ করবে না সে বস্তুত হযরত মসীহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করে। তবে সেসব লোকের ক্ষেত্রে বিলাপ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য হতে পারে না, যাদের জামাত এখনও স্বল্প সংখ্যক এবং জাতি বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়। আরেকটি হচ্ছে আমাদের জামাত। বরং কেবল এ জামাতই উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাব ও প্রয়োগের বাইরে। কেননা এ জামাতের লোক সংখ্যা এখনও মাত্র কয়েকজন বিধায় তাদের ওপর 'জাতি' শব্দ প্রযোজ্য হতে পারে না। হযরত মসীহ্ খোদার পক্ষ থেকে ওহী পেয়ে জানিয়েছিলেন, আকাশে নিদর্শন প্রকাশিত হলে পৃথিবীর সমুদয় দল যারা বিপুল সংখ্যক হওয়ার দরুন 'জাতি' বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, তারা বিলাপ করবে। তাদের কেউ বাদ পড়বে না, কেবল সেই অল্প সংখ্যক লোকের জামাত ছাড়া যাদের ওপর জাতি শব্দ প্রযোজ্য হতে পারে না। খৃষ্টানরাও এ ভবিষ্যদ্বাণীর আওতার বাইরে থাকতে পারে না, এ যুগের মুসলমানও না, ইহুদীও না আর অন্য কোন প্রত্যাখ্যানকারীও এ ভবিষ্যদ্বাণীর আওতার বাইরে থাকতে পারবে না। কেবল আমাদের জামাতই এর বাইরে আছে। কেননা আল্লাহ্ তাদেরকে এখন মাত্র বীজস্বরূপ বপন করেছেন। নবীর বাণী কখনও কোনোভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে না। এ বাণীটিতে যেহেতু পরিষ্কার এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতি বিলাপ করবে, কাজেই এ সকল জাতির মাঝে কোন্‌টিই বা এর বাইরে থাকতে পারে? মসীহ্ তো এ শ্লোকে কোন জাতিকে বাদ দেন নি। তবে এমন জামাত অবশ্য বাদ যাবে যারা এখনও জাতির পর্যায়ে উপনীত হয় নি, যেমন আমাদের জামাত। বস্তুত এ ভবিষ্যদ্বাণী এ যুগে অতি স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে। কেননা হযরত মসীহ্ সম্পর্কে যে সত্য এখন উদ্ঘাটিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে এ সমুদয় জাতির বিলাপের কারণ। কেননা এর দ্বারা এদের সকলের ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মসীহ্‌র ঈশ্বরত্ব নিয়ে খৃষ্টানদের হই চই হা হুতাশে পরিণত হয়। মসীহ্ জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠে গেছেন বলে দিন-রাত মুসলমানদের হঠকারিতা ক্রন্দন ও বিলাপের রূপ ধারণ করে যায়। আর ইহুদীদের তো কিছুই আর থাকে না। (চলবে)

অনুবাদ - **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

জরুরী সংশোধনী

পাক্ষিক আহমদীর ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ সংখ্যায় নিম্নোক্ত তথ্যগত ত্রুটি সংশোধন করে নেয়ার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। যিনি এ ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করেছেন খাকসার তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

পৃষ্ঠা নং	কলাম	লাইন	ভুল	শুদ্ধ
সম্পাদকীয়	২য়	২২	এডভোকেট খাজা কামাল উদ্দীন	ডাঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসেন শাহ্
১৯	১ম	১	২৬শে মে	২৫শে মে

- নির্বাহী সম্পাদক

১৯৯৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিম্নে তুলে ধরা হ'ল ঃ

প্রশ্ন নং ১ ঃ অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে বেহেশ্‌ত এবং দোযখের ধারণা ব্যাখ্যা করবেন কি? সেগুলো কোথায় এবং কেমন বৈশিষ্ট্যময়?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ আপনি তরঙ্গের (Waves) ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন কি? কীভাবে এদের বাস্তব অস্তিত্ব আমাদের চারপাশে বিদ্যমান রয়েছে? আপনি কি এদের স্পর্শ করতে সক্ষম? আপনি কি এদের গন্ধ নিতে সক্ষম? অথবা তাদের অনুভূতি যেকোনভাবে? যখন এই কামরাটা সেই ধরনের হাজারো তরঙ্গে পরিপূর্ণ, যা কিনা রেডিও অথবা টেলিভিশন এবং অন্যান্য এ ধরনের যন্ত্রপাতি গ্রহণ করতে পারে। যাই হোক, কেউই এদের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারবে না, কারণ প্রত্যেকেই সত্যিকার অর্থে বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া এদেরকে দেখতে অক্ষম। যদিও আমরা জানি যে, এরা চারমাত্রিক কোণে (Four dimensious) পৃথিবীতে সত্তাধীন রয়েছে। আরো কথা হ'ল, বিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে এবং বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, সেই জিনিসের বাস্তব অস্তিত্বে বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বিবৃতি অনুযায়ী যা-কিনা প্রায় চৌদ্দশ' বছর পূর্বে স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল সেখানে বেহেশ্‌ত এবং দোযখের ধারণা পৃথিবীবাসীর সামনে তুলে ধরা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিবৃতি অনুযায়ী এটা বিস্ময়কর যে, জান্নাত বা বেহেশ্‌ত অথবা স্বর্গ এই গোটা মহাবিশ্ব (Universe) পরিব্যাপ্ত করে আছে। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে একটা বইয়ের পক্ষে এটা ঘোষণা দেয়া বিস্ময়কর যে, বেহেশ্‌ত বা স্বর্গ সর্বত্রই বিরাজমান, এমনকি, সেই জায়গাটাও যেখানে লোকগুলো অতি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছে। এটা সেই সময়ের লোকদের জন্য একটা অস্বাভাবিক ঘোষণা ছিল মহাবিশ্ব সম্বন্ধে তাদের খুব সামান্যই ধারণা ছিল। একদা মহানবী (সঃ)-এর এক সাহাবী দাঁড়ালেন এবং একটা প্রশ্ন করলেন। তার প্রশ্নটা ছিল ভিন্নতর চমক লাগানো কিন্তু আকর্ষণীয়। তিনি প্রশ্ন করলেন, যদি বেহেশ্‌ত গোটা মহাবিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত হয় তাহলে দোযখ কোথায়? মহানবী (সঃ) ছিলেন আল্লাহ্ কর্তৃক সর্বাধিক আলাকপ্রাপ্ত, কাজেই তিনি বিভিন্ন মাত্রার (dimensious) ধারণা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তা না হলে তিনি এ উত্তর প্রদান করতেন না। তিনি (সঃ) বলেছিলেন, দোযখও বিদ্যমান রয়েছে এই একই মহাবিশ্বের ভিতরেই; কিন্তু তা তুমি বুঝতে পারবে না। বস্তুত এ ধরনের ধারণা বোঝার মত যোগ্যতা সে সময়ের লোকদের ছিল না। কিন্তু আজকের মানুষ ক্রমে ক্রমে এটা বুঝাতে পেরেছে যে, যদি সেখানে পদার্থগুলো ভিন্নরূপ মাত্রার অধিকারী হয় তাহলে তারা একই সময়ে সহ-অবস্থান করে, তথাকথিত এ মহাশূন্যে (space)। তারা পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না এবং তাদের পরস্পরের সাথে কোন সম্পর্কও নেই। এটা এমন যে, যদি একটি অস্তিত্বমান থাকে তাহলে অপরটি নয়; কিন্তু তারা একই সময়ে সহ-অবস্থান (Coexist) করতে পারে। এটাই হ'ল বেহেশ্‌ত বা দোযখের ধারণা যা কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন নং ২ ঃ পুনর্জন্মবাদের ব্যাপারে ইসলামিক অভিমত কী? আমাদের জন্মের পূর্বেই কি আমাদের আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল? যদি হয় তাহলে এটা কি তার পিতা-মাতাকে সনাক্ত করতে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন ঃ আমরা কোন আকারেই পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি না যে, আত্মা আল্লাহ্‌র সাথে স্থায়ী বা চিরন্তনরূপে বেঁচে থাকে। এটা একটা হিন্দু পুরাণতত্ত্ব (Mythology) এবং পশ্চিমা জনগণ এর প্রতি ঝোঁক দেখায়। এর একমাত্র কারণ হ'ল তারা পুরোপুরিভাবে এ পুরাণতত্ত্ব বোঝে না। তারা তাদের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে জীবন্ত ও পুনর্যাপনে সক্ষম হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। এই আকাঙ্ক্ষা এমন চিন্তা বা বিশ্বাস যা তাদের মন বলে সত্য, কাজেই তা সত্য এবং এটাই তাদের এই পুরাণতত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপনে পরিচালিত করে। কোন আত্মাই স্বাধীনভাবে বিদ্যমান থাকে না। সকল আত্মাই একটা শরীরে বাস করে এবং শরীরেই জন্মায় যা আমাদের এখানে আছে। যাই হোক, যখন তারা শরীর ত্যাগ করে তখন তারা আল্লাহ্‌র নিকট পৌছে। তাদের এ পৃথিবীতে ফিরে আসার আর কোন সুযোগই থাকে না। তারা আল্লাহ্‌র নিকট যায় এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন কীভাবে তাদের বিচার করবেন-সেই অনুযায়ী যেভাবে তারা পৃথিবীতে অতিবাহিত করেছে। যেহেতু পরকাল থেকে কোন কিছুই আর ফিরে আসে না। এটা হল সেই বিশ্বাস যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ছিল। এটা হ'ল সেই বিশ্বাস যা স্রষ্টা কর্তৃক মানুষের কাছে প্রেরিত সকল ঐশ্বরিক ধর্মের বিপক্ষে আর অবশিষ্ট সব কিছু শুধুই পুরাণতত্ত্ব এবং স্বপ্নচারিতা- এছাড়া আর কিছুই নয়।

[রিভিও অব রিলিজিয়নস্ এর মার্চ, ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত এ লেখাটির অনুবাদ করেছেন- **আবূ জাকির আহমদ**]

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পর্ব ৩ ঃ অধ্যায় ঃ ১

ধর্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধান

ভয় থেকে উপাসনার এ উদ্ভট চিন্তাধারাটি আরেকটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিনিয়ত পুলিশ কর্মকর্তা, ট্রাফিক ওয়ার্ডেন বা ম্যাজিস্ট্রেটদের আইন-প্রয়োগ ক্ষমতাকে সমীহ করে চলি, অপপ্রয়োগ হলে ঘৃণা করি, কিন্তু কখনো তাদের উপাসনা করি না। একইভাবে প্রাচীন মানুষ কোন সিংহ বা মাংসভোজী বৃহৎ প্রাণী দেখে ভয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, কিন্তু কখনই তার সামনে সেজদারত হয়ে তার মর্যাদাকে স্মরণ করে অনুকম্পা ভিক্ষা করে নি (Rather than to fall prostrate before him, and begging for his mercy) । বজ্রধ্বনি, ঝড়ো হাওয়া বা বৈশাখের তপ্ত-সূর্য এ সকলের ক্ষেত্রে একই মনোভাব তারা ব্যক্ত করেছে। সমাজ বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা সত্ত্বেও সূর্য বা নক্ষত্র বন্দনার পশ্চাতে প্রাচীন মানুষের এ জাতীয় ভয় বা লোভ কাজ করেছে- তা মূলতঃ একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। তাছাড়া, এর পশ্চাতে বিজ্ঞান-ভিত্তিক এমন কোন প্রমাণাদি নেই যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মানুষের অনগ্রসর চিন্তা ধারার শুরুতে সে ছোট ছোট শক্তিকে উপাসনা করেছে, তারপর ক্রমোন্নতির সাথে সাথে বৃহৎ শক্তি ও কল্পিত শক্তির উপাসনার দিকে মনোযোগী হয়েছে।

তবে বস্তুর রূপান্তরিত হওয়ার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই যে ব্যাখ্যা, অর্থাৎ স্তরে স্তরে জীবনের অগ্রগতির (stage by stage advancement of life) প্রক্রিয়া তার সাথে কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কিত মনোভাবের কোন মিল তারা দেখাতে পারে নি। এমন একটা আদি সমাজ বা মানব গোষ্ঠীর দৃষ্টান্তও তারা পেশ করতে পারে নি। যারা আদিতে বহু ঈশ্বর বা কুসংস্কারে বিশ্বাস থেকে ক্রমাগত উন্নতি করে একেশ্বরবাদীতে পরিণত হয়েছে। অথচ তারা ঈশ্বর সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় মানুষের আপাত অসচেতন এ অবস্থা থেকে ভয় বা ভীতি-জনিত দুর্বলতা কাটানোর জন্য ঈশ্বরের ধারণা বা চেতনার কথাই বার বার বলে আসছে। তারা কীভাবে আদি মানুষের অজ্ঞতা ভয় বা ভীতিকে মোকাবেলার জন্য ঈশ্বরের ধারণাকে প্রচলিত করার এ কথাই একটি সর্বসম্মত বা সর্বজনগ্রহণযোগ্য সমাধান হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারলো?

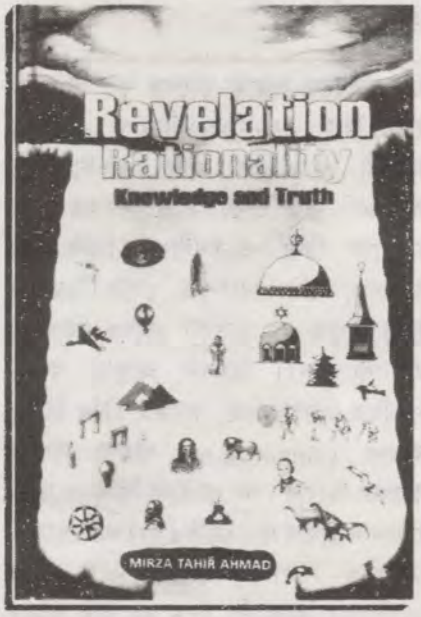

দেখা যাক্, সমাজতান্ত্রিকদের ব্যাখ্যায় মানুষের উপাস্য বস্তু বা বিষয় কীভাবে বিকশিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতিকুল শক্তিকে বাগ মানানো যেমন, ঝড়, বজ্রধ্বনি, অতিরিক্ত উত্তাপ ও শৈত্যতা থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করার তাগিদ থেকেই নাকি প্রথমে তারাও এসব প্রাকৃতিক শক্তিকে খোদা জ্ঞানে উপাসনা করেছে। তারপর উপাস্য হিসাবে এসেছে বস্তুগত বিষয়, বা সেসব শক্তিশালী প্রতিপক্ষ যা তাদের হৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক করেছে (worship of material objects that struck terror in their hearts)। এর মাঝে আবার প্রথমে এসেছে জড় (inanimate) বিষয়ের প্রাধান্য, তারপর এ জড়-বিষয় থেকে পশু-পাখী বা জীব জন্তুর উপাসনা। সাপ, বিচ্ছু, বানর বা বনের খুব কম পশুরাই এথেকে বাদ পড়েছে।

শুধু উপাসনা করেই তারা ক্ষান্ত থাকে নি। এসব উপাস্যদের খুশী করা বা তাদের সু-দৃষ্টির জন্য তারা এর মাঝে অনেক আচার অনুষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে এবং এগুলোকেই বিধান আকারে গ্রহণ করার জন্য লিখিত বই বা বিবরণী হিসাবে সংকলন করেছে (Finally scriptures were compiled)। এ সমাজ-তাত্ত্বিকরা নিজেদের কল্পনার দৌড়কে আদি মানুষের ঘাড়ে যেভাবে প্রতিস্থাপন করেছে, এর জন্য অবশ্যই তারা কিছুটা প্রশংসার দাবী করতে পারে (a tribute to the intellect of sociologists)।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে, এসব সমাজ বিজ্ঞানী মানুষের কুসংস্কারচ্ছন্ন আদিম ধারণা ও ঐশী বাণীর ভিত্তিতে পৃথিবীর বড় বড় ধর্মমতের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে, তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু যে ব্যর্থ হয়েছে তা-ই নয়, তারা এটাও লক্ষ্য করে দেখে নি যে, তাদের উল্লেখিত যাজক, ভবিষ্যদ্বক্তা বা কিংবদন্তীর প্রাচীন দেব-দেবীর কোন ভাষ্যে এটা কখনো সুস্পষ্ট হয় নি যে, কোন্ ঐশী বাণীর ভিত্তিতে তারা তাদের দাবীর কথা বলেছে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। একইভাবে তারা যে ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে এ দাবীকেও কখনো তদানীন্তন সমাজ কর্তৃক চ্যালেঞ্জ করা হয় নি। কেননা, সমাজের বিরাজমান রীতি অনুযায়ীই পদের কর্তৃত্ব পুরুষানুক্রমে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং বুঝেই হোক অথবা প্রচলিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবেই হোক, সমাজ সেটাকে মেনে নিয়েছে (was accepted as such by the society)। তারা তাদের দাবীর স্বপক্ষে ঐশী নিদর্শন পেশ করার কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হয় নি এবং ভাওতা ও গোঁজামিলপূর্ণ বিভিন্ন কথা-বার্তা তারা বিনা প্রতিবাদে চালিয়ে যেতে পেরেছে। আর সেই সময়ে সাধারণ মানুষও ছিল সহজ কথায় বিশ্বাসী (credutous), তাই তথাকথিত খোদার সাথে এসব দাবীকারকের সংযোগ থাকার কথা-তারা বরং চমৎকৃত (impressed) হয়েছে। অথচ এটা ছিল প্রবঞ্চনারই অন্য নাম (which was more than a ruse)। দেখা যাচ্ছে, মিথ্যা ঈশ্বরের সাথে মিথ্যা সংযোগকারীদের এটা ছিল এক ধরনের মিথ্যা উদ্ভাবন মাত্র (the false gods were thus supported by false claimants)। কিন্তু নির্বিবাদে তারা সেই মিথ্যা আচার-অনুসরণ করেই স্বস্তি অনুভব করেছে। যাই হোক, অতীতে যারা এ ধরনের ভবিষ্যদ্বক্তার (seers) ভূমিকা পালন করেছে, তাদের সাথে ঐশী বাণীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় অবতার বা নবী রসূলদের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য বিরাজ করে। সংক্ষেপে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি মূখ্য বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

(১) প্রতিমা-পূজারী যাজক শ্রেণী প্রধানত কোন প্রতিষ্ঠিত মন্দির বা সংগঠনকে কেন্দ্র করে পরিদৃষ্ট হয়।

(২) তারা প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ বা সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে কোন মনোভাব

প্রকাশ করে না। তাই সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার, উপকথা, কিংবদন্তী তা যতই অধোগামী হোক্ না কেন তারা তার সাথে সায় দিয়ে চলে।

(৩) প্রায়শই তারা প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার সহায়তাকারী এবং বিশেষ করে বিরাজমান রাজনৈতিক দল বা নেতৃবৃন্দের ধর্মীয় মনোভাবের অনুকূলে কাজ করে। তবে কোন কোন সময় কিছু প্রতিবাদী কণ্ঠ বা ব্যক্তিত্বেরও উদ্ভব হয়, যারা সম-সাময়িক শাসক বা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে (instances of rebellion by religious leaders against the monarchs of their time)। এরূপ ঘটনা অবশ্য ব্যতিক্রম মাত্র (Yet these are exceptions)। কেননা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এরূপ দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃত্ব প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে বজায় রেখেই তাদের কৌশলগত কর্মকান্ড চালিয়ে যায়, যেখানে শক্তির ভিত্তি হিসাবে ওই সব ভুল বিশ্বাস, উপকথা, রূপ কথার সাথে তারা একাত্মতা প্রকাশ করে চলে (serves the cause of a popular myth and philosophy firmly noted in a strong power base)।

আর অপরিহার্যরূপে ঐশী বাণীবাহক ব্যক্তিত্ব, যারা সৃষ্টিকর্তার একত্বকে প্রতিষ্ঠাকল্পে পৃথিবীর বড় বড় ধর্মের প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাদের সাথে উপরিল্লিখিত কারণেই যাজক শ্রেণীর (পার্থক্য) সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ইতিহাসের আলোকে আমরা এ দিকটির পর্যালোচনা করতে পারি।

অতীতকালে যারা এ পৃথিবীতে বড় বড় ঐশী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যেমন, হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং অন্যান্য নবী-রসূল, তারা কেউই কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বা সংগঠিত গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছিলেন না (none of them ever represented a well-established and popular religious order)। একটি একক কণ্ঠ, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত দর্শন ও জীবন বোধের দাবী নিয়ে তারা দন্ডায়মান হয়েছে (advocated a new philosophy demanding a completely different way of life)। তবে তাদের সময়কালীন একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যুগের বড় বড় ধর্মীয় দলগুলো বহুদলে বিভক্ত, এবং নিরীহ জনসাধারণের উপর কে তার নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দিয়ে নেতৃত্বে আসীন হবেন-এ দ্বন্দ্বে জড়িত থেকেছে (fought among themselves for gaining greater domination over the ignorant masses)। অথচ, এ ক্রান্তি লগ্নে যখনই খোদার পক্ষ থেকে একজন ঐশী দাবীকারকের আবির্ভাব হয়েছে, তখন বিবদমান দলগুলো নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ভুলে এক যোগে উক্ত ঐশী মত বা তত্ত্বের বিপক্ষে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছে (a joint colossal resistance against the newly introduced Divine order)। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এক আল্লাহ্ ছাড়া উক্ত দাবীকারকের আর যেন কোন সহায় নেই। কেউ তার কথা শুনতে চায় না- না সাধারণ লোক, না কোন রাজনৈতিক শক্তি। মনে হয়, সে যেন একা, পরিত্যক্ত ও প্রত্যাখ্যাত (left alone abandoned and rejected)। শুধু আল্লাহ্‌র সাহায্য ও শক্তির উপর ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস। ফলে ধীরে ধীরে মানবকল্যাণধর্মী তাদের বাণী, ঐশী সাহায্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস, আত্ম-ত্যাগ ও অন্যান্য দুর্লভ গুণাবলী পরিণতিতে তাঁদেরকেই সত্য ও মহামানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সকল যুগের সকল মানুষের ক্ষেত্রে এ একই সত্য বারবার প্রকাশিত হয়েছে। তবুও একথা আমরা অগ্রাহ্য করি না যে, সমাজ বিবর্তনের কোন পর্যায়ে বিশেষ করে তাদের পদের অজ্ঞতা ও অপরিণত অবস্থায় কিছু কল্পিত ঈশ্বর (imaginary gods) সৃষ্টি করা হয়েছিল। মুষ্টিমেয় যাজক শ্রেণী কর্তৃক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর অজ্ঞতাকে সুকৌশলে ব্যবহার করে তাদেরকে নিগৃহীত করা হয়েছিল। তবে আমরা যে তত্ত্বের বিরোধিতা করি তা হলো এই যে, আদিম মানুষের নানামুখী চিন্তাধারাই বিবর্তনের মাঝ দিয়ে কালক্রমে এক ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছে (a continuous evolutionary flow of ideas leading eventually to the belief in one God, is what we categorically deny) - তা মোটেই সত্য নয়। এটা আসলে সমাজতাত্ত্বিকদের একগুয়ে ও অলীক উদ্ভাবন মাত্র (It is a figment of the sociologists wayward fancy)।

ইতিহাস পর্যালোচনায় এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না যার সাহায্যে এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, বহু ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে কালক্রমে একেশ্বরবাদিতার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাদের এ ধারণা যে ভুল তা-ই নয়, তার উল্টোটাই বরং সত্য। পবিত্র কুরআনে যে শিক্ষা আমরা পাই এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, পৃথিবীর বৃহৎ ধর্মগুলো অনিবার্যভাবে এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল (All the major religions of the world invariably began their journey with belief in unity)। সমাজতান্ত্রিকদের বিবর্তনবাদ সংক্রান্ত এ প্রস্তাবনা যে, ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ক্রমশ নীচু স্তর থেকে উন্নত স্তরে বিকশিত হয়েছে তা ইতিহাস বা মানুষের মনস্তত্ব কোন দিক থেকেই ধোপে টিকে না।

আমরা জানি নবী-রসূলদের চরিত্র একটি খোলা পুস্তকের মত এবং নবুওয়তের দাবীর পূর্বেকার জীবন ও তাদের এত পবিত্র ও স্বচ্ছ যে কোন ব্যক্তিগত লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে তারা পরবর্তীতে জাল বা প্রতারণামূলক নবুওয়তের দাবী করবে তা একটি অকল্পনীয় ব্যাপার। খোদার একত্বের সুদৃঢ় দাবীকারক ও সমর্থনকারী সমস্ত নবী রসূল, বিশেষ করে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) মূসা এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনে এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ কখনো পেশ করা সম্ভব নয়।

একথা হয়ত অনেকেই জানেন যে, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময়ে হযরত নূহ (আঃ) কর্তৃক এক ঈশ্বরের উপাসনার ধারণাটি বিকৃত হয়ে বহু ঈশ্বরের বিশ্বাসে রূপ নেয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুনরায় একেশ্বরবাদিতার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক দুঃসাধ্য সংগ্রামে রত হন (launched a gigantic struggle for the restoration of unity)। দীর্ঘকাল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অধঃস্তন পুরুষ ও সন্তান-সন্ততি একেশ্বরবাদের এ বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখেন।

কিন্তু যুগ-সংক্রান্তির মাঝ দিয়ে কয়েক শত বছর অতিক্রান্ত না হতেই বনীইসরাঈল পুনরায় প্রতিমা পূজার দিকে ঝুঁকে পড়ে, যা মূসা (আঃ) পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। যদিও হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন একেশ্বরবাদিতা প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান যোদ্ধা (Outstanding champion), কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতেই তার অনুসারীদের মাঝে বহু প্রতিমা পূজার বিশ্বাস পরিদৃশ্যমান হয়। এ ঐতিহাসিক দিকটি নিঃসন্দেহে এ কথাকেই বরং সুস্পষ্ট করে তুলে যে, একেশ্বরবাদিতার বিশ্বাস থেকে বহু দেব দেবী বা প্রতিমা পূজার বিশ্বাসে ফিরে যাওয়া একটি ক্রম অবনতি বা ক্ষয়িষ্ণু ধারাতে প্রবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়া যা ঐশী-নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে পরিণতি লাভ করে। এ পরিস্থিতিতে কুসংস্কার ও বহু দেবতার বিশ্বাসই সাধারণত সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আরেকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আমরা এখানে করতে পারি। হযরত

ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক 'বায়তুল হারাম' বা পবিত্র গৃহ এক খোদার উপাসনার জন্য তৈরী হলেও কালক্রমে সেখানে উপাস্য হিসাবে অনেক প্রতিমা বা মূর্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কা'বা ঘরের নাম ছাড়া সেখানে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে নি। একে একে সেখানে চান্দ্র বছরের প্রতি দিনের জন্য উপাসনা করার মানসে ৩৬০টি মূর্তিকে অধিষ্ঠিত করা হয়, আর প্রতিটি কক্ষে, দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত তা পূর্ণ করে ফেলে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, কা'বা গৃহের সর্বত্র এসব মূর্তির জায়গা তো ছিল, কিন্তু যে খোদার উপাসনার জন্য এ গৃহ নির্মিত হয়েছিল, তাঁর জন্য কোন জায়গা বাকী রইলো না (There was room for all of them, but no room for God)।

তাই, এ বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখা দরকার যে, সমাজতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যার সত্যতা কি এখানেই? এটাই কি তাদের অভিমত যে, বহু দেব-দেবী ও প্রতিমা পূজা থেকে কালক্রমে এক ঈশ্বরের বিশ্বাস জন্ম লাভ করেছে? এটাই কি মানুষের ক্রম উন্নতি বা ভাবনার প্রতিফলন যে, আদিম অবস্থা থেকে অগ্রসর হয়ে সে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতিকল্প নির্মাণ করেছে? না, কখনোই নয়। সকল ধর্মের ইতিহাসই সমাজতান্ত্রিকদের নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলনকে এক বাক্যে অস্বীকার করেছে। বরং সত্য এটাই যে, এক খোদাতে বিশ্বাসের দিকটি সর্বদা তাঁর নিকট থেকেই অবতরণ করে থাকে। শুরুতে প্রতিমা পূজার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়ে কখনোই ধীরে ধীরে খোদার প্রতি বিশ্বাসে পরিণতি লাভ করে না। এগুলো কতিপয় সমাজতান্ত্রিক, লেখক দার্শনিকের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতএব বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় যে সত্যটি বেরিয়ে আসে তা হলো এই যে, একেশ্বরবাদিতার একটি সমাজ ধীরে ধীরে প্রথাগত অন্ধবিশ্বাস বা মনগড়া ধারণার কারণে বহু ঈশ্বর বা প্রতিমা পূজার চর্চাতে অধঃপতিত হয়, এর উল্টোটা কখনোই সংঘটিত হয় না (Monotheistic societies to slowly degenerate into the polytheistic ones; the opposite never occures)। এর মূলে যে কারণটি কাজ করে তা হলো এই যে, ধর্মীয় বিশ্বাস সময়ের ক্রমিক ধারায় উত্তরাধিকারীদের মাঝে অনেকটা দুর্বল হয়ে যায়। সাধারণত ধর্মগুরু বা কোন নবী, যিনি মানুষকে দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র একত্বের কথাই বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেই বিশ্বাসের ভিত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, আর বহুবিধ কুসংস্কার ও কায়েমী স্বার্থবাদী-তত্ত্ব সেখানে জন্মলাভ করে। এভাবেই মিথ্যা দৈববাণীপ্রাপ্ত লোকদেরকে সাজানো হয়, যারা নিজেদের রুজি-রুটির ধান্ধায় সাধারণ মানুষ বা জনগণকে প্রতারিত করে নিজেদেরকে এক অসৎ ধর্মসেবক গোষ্ঠী হিসেবে বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে (Orocles begin to be concocted from temple to temple and a dishonest religious clergy feels free to deceive the common masses)।

ধর্মের ইতিহাসে আরেকটি বিষয়কে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে দেখা হয় আর তা হলো নৈতিকতা। আর এ নৈতিক দিকটি ধনী গরীব নির্বিশেষে ন্যায্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই সকল নবী-রসূল বিশেষভাবে শিক্ষা দেন (Morality as taught and the prophets, always works on the side of justice and fairplay)। আর এর বিবেচনা সর্বাদই দুর্বল ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের অনুকূলেই হয়ে থাকে, যাতে নিপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত ও দুর্গতদের মত শক্তিশালী হতে পারে (It always strengthens the hands of the pressed against the oppressor)।

তাহলে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর বুকে কোথায় ধর্মীয় নৈতিকতা নিপীড়িতদের বিরুদ্ধে নিপীড়নকারীর পক্ষ নিয়েছে? আপনারা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখলেও এর পক্ষে একটি দৃষ্টান্তও দেখতে পাবেন না (search the entire early history of the dawn of religions and you will not find a single such example)। বরং হাজারো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে এমন যেখানে ধর্মীয় বিধান দুর্বল ও গরীবদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছে (It always legislated in favour of the weak and the poor)। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একজন বিশ্বাসী যখন কোন ঐশী বিধানের বাস্তবায়ন করেন, তখন এ অনুভূতি সর্বদা কাজ করে যে, তার সর্বজ্ঞ খোদা তাকে দেখছেন, এমনকি তার মনোভাবও তিনি জানেন। কোন মানব রচিত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কখনো এ অনুভূতি কাজ করে না, কাজেই আইন রচয়িতা বা প্রয়োগকারীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে অপরাধী ব্যক্তি সম্ভাব্য তৎপরতা ও উপায় অবলম্বন করে চলতে থাকে। এভাবে অপরদিকে ফাঁকি দেয়া বা লুকিয়ে রাখার প্রবণতা মানব রচিত আইনে হর হামেশাই ঘটতে দেখা যায়। এজন্যেই মানব রচিত আইন কখনো এককভাবে সামাজিক অবক্ষয় বা সংকটকে নির্মূল করতে পারে না, কেননা হৃদয়ের যে অন্ধকার অতলে অপরাধ ও পাপ-চিন্তা পুষ্টি লাভ করে, সেই এলাকাকে আলোকিত করা মানব-রচিত বিধানের পক্ষে সম্ভব নয় (legislation alone can never succeed in uproting of reaching the dark abysees where crimes are nurtured)। এটা মাত্র সম্ভব সত্যিকার ধর্মীয় শিক্ষার বাস্তবায়নের মাধ্যমে, যেখানে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও ভাল-মন্দ কর্মকান্ডের জন্য সে আল্লাহ্‌র নিকট হিসাব দিতে বাধ্য-এ মনোভাব কাজ করে। এ দায়বদ্ধতাই তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, আর যে কোন ধর্মের পক্ষে এ নৈতিক বিবেচনাই যে কোন ঐশী বিধানের মূখ্য উদ্দেশ্য (This has been the purpose of moral legislation on the part of religion)।

আর এ নৈতিকতার আলোকরশ্মি যতদিন কোন ধর্মের মাঝে সজীব থাকে, ততদিন পর্যন্ত ওই ধর্মীয় ব্যবস্থাও কার্যকর থাকে। যখনই এ নৈতিকতার মানদন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে, সেই মুহূর্তে ধর্মীয় অবয়বও অন্ধকারে ঢেকে যায়। এর ফলে মানব রচিত কোন মহৎ আইন বা সংবিধান যেরূপ কলংকিত হয়, আধ্যাত্মিকতার চূড়ায় অধিষ্ঠিত কোন ধর্মীয় শিক্ষাও তখন সমাজে বিরাজমান অন্ধকার দূরীকরণে ব্যর্থ হয়। উঁই পোকার মত এ নীতিহীনতা মহান ধর্মের বড় বড় সৌধগুলোকে ঢিবিতে পরিণত করে ধ্বংস করে ফেলে (Like termites, it razes to the ground, the lofty moral structures of great religions)।

এসব প্রবণতাকে সামনে রেখেই অবক্ষয়ী ধর্মীয় ব্যবস্থা বা কায়েমী স্বার্থবাদী ধর্মীয় আচার-আচরণকে আমাদের বুঝতে হবে। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, যখনই আল্লাহ্‌র একত্বের বিষয়টি ভাগ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, ধর্মীয় নৈতিকতাও তখন থেকেই ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। আর পৌত্তলিকতা ধীরে ধীরে আল্লাহ্‌র একত্বের জায়গা দখল করে, ফলশ্রুতিতে খোদার ঘরে প্রতিমা প্রতিস্থাপিত হয়, খোদার ঘর মন্দিরে রূপ লাভ করে (idols occupy the houses of God, turning them into temples)। (চলবে)

- অধ্যাপক মোহাম্মদ আমীর হোসেন

রোযা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

মূল ঃ মোহতারম আব্দুল মাজেদ তাহের, লন্ডন

রোযা কার জন্যে ফরয?

রমযানের রোযা প্রত্যেক বালেগ, বুদ্ধিমান, সুস্থদেহী, মুকীম (ভ্রমণের অবস্থায় নয় এমন ব্যক্তি, যিনি বাড়ীতে অবস্থান করছেন -অনুবাদক) মুসলমান পুরুষ ও মহিলার জন্যে ফরয বা অবশ্য-করণীয়। ভ্রমণকারী ও রোগীদের জন্যে এ অবকাশ রয়েছে যে, তারা অন্য দিনে ঐ রোযাগুলো পুরো করবে যেগুলো তারা রাখতে পারেনি। চিররোগী যারা, যাদের স্বাস্থ্য ফিরে পাবার কোন আশা নেই অথবা যারা এমন দুর্বল বা যারা এত দুর্বল যে পরেও রোযা রাখার শক্তি ফিরে পাবার যাদের সম্ভাবনা নেই, প্রসূতী (বাচ্চাকে দুধ পান করায় এমন মহিলা) এবং গর্ভবতী যারা ক্রমাগতভাবে ঐ অসুবিধায় নিপতিত থাকে এমন অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ সামর্থ্যানুযায়ী রোযার বদলে ফিদিয়া দিবে (ফিদিয়ার ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হচ্ছে)।

রোযা রাখার বয়স ঃ

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) 'বাবু সাওমুস্ সাবিয়্যান' অর্থাৎ বালক-বালিকাদের রোযা প্রসঙ্গে আলাদা অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন আর এর মধ্যে হযরত উমর (রাঃ)-এর বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন, যা তিনি এক মাতাল ব্যক্তিকে বলেছিলেন– "ওয়ায়িলাকা ওয়া সাবিয়্যানানা সিয়ামুন ফা যারাবাহু" অর্থাৎ তুই ধ্বংস হ! আমাদের শিশুরা রোযা রাখছে আর তুই কিনা মদ গিলেছিস? সুতরাং তাকে বেত মারা হলো।

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরাহ্ (দশই মহর্‌রম)-এর রোযা প্রসঙ্গে রেওয়ায়াত করতে গিয়ে হযরত রুবাইয়ে বিনতে মু'আওয়েজ বর্ণনা করেন, "আমরা এ রোযা রাখতাম এবং বাচ্চাদের দ্বারাও রাখাতাম এবং তাদেরকে হাসি-খুশী রাখা ও খেলা-ধূলায় নিয়োজিত রাখার জন্যে তূলার এক প্রকার খেলনা (বল জাতীয় খেলনা) তৈরী করে দিতাম এবং যখন তাদের খাবার সময় হোত তখন তারা কান্নাকাটি করলে খেলনা দিয়ে দিতাম আর এভাবে ইফতারের সময় পর্যন্ত তাদের ব্যস্ত রাখতাম" (বুখারী কিতাবুস্ সাওম, বাবু সাওমুস্ সাবিয়্যান)।

এই যে রোযা, যার মধ্যে বাচ্চাদের কঠোরতার সাথে রোযা রাখানোর ব্যাপারটি বর্ণিত হয়েছে তা রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বের বিষয়। ইতোপূর্বে শরীয়তের বিধান মতে সারা বছরে কেবল একদিন রোযা রাখা হোত যা কিনা তুলনামূলকভাবে বেশী বয়সের বাচ্চাদের দ্বারা রাখিয়ে নেয়া হোত। প্রকৃতপক্ষে বেশী বয়সের বাচ্চাদের দ্বারা এরূপ এক আধটি রোযা রাখিয়ে নেয়া কোন দোষ মনে করা হোত না।

☆...হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) রোযা রাখার বয়স সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন :

"কেউ আছে যারা ছোট বাচ্চাদের দ্বারা রোযা রাখান, যদিও প্রত্যেকটি ফরয ও আদেশের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সীমা নির্ধারিত ও ভিন্ন ভিন্ন সময় হয়ে থাকে। আমাদের নিকট কোন কোন আদেশ-নিষেধের সময় চার বছর বয়স থেকে আরম্ভ হয় এবং কতক আদেশ-নিষেধ এ রকম যার সময় সাত বছর থেকে বার বছর নির্ধারিত আর কতক এ রকম যার সময় ১৫ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত বয়সের যুবকদের ওপরে আরোপিত হয় এবং ইহাই সাবালকত্বের সীমারেখা। ১৫ বছর বয়স থেকে রোযা রাখার অভ্যেস করানো দরকার আর ১৮ বছর বয়স থেকে রোযা ফরয মনে করা উচিত। আমার মনে আছে যে, যখন আমরা ছোট্ট ছিলাম আমাদেরও রোযা রাখার শখ হোত কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের রোযা রাখতে দিতেন না। আর আমাদের রোযা রাখার ব্যাপারে কোন প্রকার নির্দেশ দেয়া পসন্দ করা ব্যতিরেকে সর্বদা আমাদের ওপরে প্রভাব খাটাতেন। তাই বাচ্চাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে রোযা রাখা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা উচিত। এর পরে যখন তাদের জন্যে সময় হয়ে যায়, যখন তারা নিজেদের পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছে যায়, যখন ১৫ বছরের সময়কাল এসে যায় তখন তাদের দ্বারা রোযা রাখানো হোক আর তা-ও ধীরে সুস্থে। প্রথম বছর যে কয়টি রাখে পরবর্তী বছর তাথেকে অধিক এবং তার পরবর্তী বছর তাথেকে অধিক এবং তার পরবর্তী বছর তাথেকে অধিক রাখানো হোক। এভাবে ক্রমাগত তাদেরকে রোযায় অভ্যস্ত করা দরকার" (আল্ ফযল, ১১ই এপ্রিল, ১৯২৫ ইং)।

☆....হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন,

"সাধারণতঃ ইহা দেখা যায় যে, মায়েরা তাদের বাচ্চাদের ওপরে এ ব্যাপারে দয়া দেখান, বলেন, তাদের বয়স কম এজন্যে রোযা রাখতে দেয়া হয় না। কখনও শিশুরা অধিক উৎসাহ দেখায় কিন্তু মায়েরা তাদেরকে শক্তি প্রয়োগে বিরত রাখে। ইহা ঠিক কথা যে, বাচ্চাদের জন্যে রোযা ফরয নয় কিন্তু শৈশবকাল থেকেই যখন বাচ্চারা নামায পড়া আরম্ভ করে যদি তাদেরকে রোযার আদব-কায়দাগুলো শিখানো হয়, তাদেরকে রোযা রাখার দৃষ্টান্ত না দেখানো হয় অর্থাৎ তাদেরকে রোযা রাখার ব্যাপারে কিছু কিছু অভ্যস্ত করা না হয় তাহলে যখন তারা সাবালক হয় তখন তাদের মধ্যে রোযার মাহাত্ম্য জাগ্রত থাকে না। আমাদের তো মনে আছে যে, কাদিয়ানের যুগে খোদার অনুগ্রহে যখন রোযার মান বড়ই উন্নত ছিলো তখন বিনা অসুবিধায় কোন আহমদী রোযা পরিত্যাগ করতেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার খুব প্রভাব ছিলো। এজন্যে ঐ যুগে কেউ বলতে পারতো না যে, আহমদীরা রোযার ব্যাপারে দুর্বল। ঐ সময়ে এই নিয়ম ছিলো যে, শৈশবকাল থেকেই মায়েরা ঘরে শিক্ষা দিতেন, এবং দশ বছর বয়সেই বাচ্চারা রোযা রাখা আরম্ভ করে দিতো। তদুপরি সাবালক বলতে ইংরেজ কর্তৃক নির্ধারিত সাবালকত্বের বয়সসীমার কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ ইহা হোত না যে, ইংরেজরা বলে দিলো ২১ বছর বয়সে সাবালক হবে অমনি ২১ বছর বয়সে সাবালক হবে আর ২১ বছর বয়স শরীয়তে ফরয হবে অথবা ইংরেজরা বলে দিলো ১৮ বছর নির্ধারিত করে দাও তাহলে ১৮ বছর বয়সের পরে শরীয়তে ফরয হবে। বরং মানবীয় পরিভাষায় এবং সাধারণ জ্ঞানে যখনই মানুষ সাবালক হতো তখন তারা পুরো রোযা রাখার চেষ্টা করতো। রোযা রাখার ব্যাপারে সাবালকত্ব প্রসঙ্গে ফকীহ্গণের মধ্যে কিছু মতভেদও পরিদৃষ্ট

হয়। বাচ্চাদের দৈহিক বিকাশের প্রেক্ষাপটে কতক ফকীহ তুলনামূলকভাবে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করেছেন। এজন্যে এ প্রসঙ্গেও অসাধারণ কঠোরতা করা হোত না। বরং মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে চেষ্টা করা হোত যে, যেসব বাচ্চা সাবালক হয়েছে অর্থাৎ ১৩-১৪ বছর বয়সে পদার্পণ করেছে, চেষ্টা করা হোত যে, তারা যেন বেশী বেশী রোযা রাখে। এসব বাচ্চারা যখন বেশী বয়সে পৌঁছে যেতো অর্থাৎ ১৮-১৯ বছর বয়সে পদার্পণ করতো তখন থেকে তারা অবশ্যই রমযানের পুরোপুরি রোযা রাখা আরম্ভ করতো" (খুৎবা জুমুআ, ৩০-৫ ১৯৮৬ ইং)।

রুগ্ন ব্যক্তি ও ভ্রমণকারী রোযা রাখবে না ঃ

আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে বলেন, ফামান কানা মিনকুম মারীযান আও 'আলা সাফারিন ফা'ইদ্দাতুম্মিন আইয়্যামিন উখার–ওয়া 'আলাল্লাযীনা ইউত্বীক্বূনাহু ফিদ্‌ইয়াতুন ত্বা'আমু মিসকীন" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রুগ্ন থাকে বা ভ্রমণে থাকে তাহলে তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পুরো করতে হবে আর ঐসব লোক যাদের পক্ষে ইহা অর্থাৎ (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাদের জন্যে ফিদিয়া একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা (সূরা বাকারাহ্ : ১৮৫ আয়াতাংশ)

আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টিতে পুণ্য নিহিত :

✯... হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন,

"পুণ্য কেবল সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত, দৈহিক কঠোরতার সাথে নয়। আর রোযার মধ্যেও দৈহিক কঠোরতা খোদার দৃষ্টিতে কোন মূল্য রাখে না। আরও অনেক কথা আছে যা দৃষ্টিতে রাখা উচিত কিন্তু কষ্ট দেয়া খোদার দৃষ্টিতে নেই। অতএব যখন খোদা বলেন যে, পরিত্যাগ করো তখন পরিত্যাগ করা উচিত। যখন খোদা বলেন, রাখো তখন রাখা উচিত। সুতরাং তিনি বলেন, "মান কানা মিনকুম মারীযান" যারা রুগ্ন, "আও 'আলা সাফারিন" অথবা ভ্রমণরত," "ফা'ইদ্দাতুম্মিন আইয়্যামিন উখার" তাহলে পরে রমযান মাসে রোযা রাখবে না পরে রেখে নিবে। "ইউরীদুল্লাহু বিকুমুল ইউসরা ওয়ালা ইউরীদু বিকুমুল 'উসরা"–এ ধারণার বশবর্তী হয়ো না যে, কঠোরতা আরোপ করলে খোদা বেশী খুশী হবেন। নিজের প্রাণকে কষ্টে নিপতিত করলে পরে আল্লাহ্ খুব সন্তুষ্ট হবেন। কষ্টে তুমি নিপতিত হয়েছো। আল্লাহ্ তো চান তোমার জন্যে স্বাচ্ছন্দ্য, কঠোরতা চান না.....অতএব খোদার ব্যাপক দৃষ্টির সম্মুখে মাথা ঝুঁকিয়ে দাও। আল্লাহ্ যান চান, যতটুকু কঠোরতা অর্পণ করেন, উহাকে গ্রহণ করো। এথেকে আগে বেড়ে গিয়ে শক্তি প্রয়োগ দ্বারা আপনি খোদাকে সন্তুষ্ট করতে পারেন না" (খুৎবা জুমুআ, ১৯-১-১৯৯৬ ইং)।

ভ্রমণে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয় :

✯....হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রা:) বর্ণনা করেন যে, একবার ভ্রমণে আঁ হযরত (সাঃ) নিজের সঙ্গীদের একটি দলকে দেখতে পেলেন যার মধ্যে এক ব্যক্তির ওপরে ছায়া দেয়া হচ্ছিলো। হুযূর (সাঃ) কারণ জিজ্ঞেস করলে বলা হলো যে, রোযাদারকে ছায়া দেয়া হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বড়ই প্রতাপের সাথে বল্লেন, "লায়সা মিনাল বিররিস্ সাওমি ফিস্ সাফরি" অর্থাৎ ভ্রমণে রোযা রাখার মধ্যে পুণ্য নেই।

(বুখারী কিতাবুস্ সাওম বাবু কওলুন্নাবী লিমান যুল্লিলা আলায়হি ওয়াশতাদ্দাল হাররা লায়সা মিনাল বির্‌রিস্ সাওমি ফিস্ সাফ্‌রি)।

✯...এভাবেই আরও একটি ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর (সাঃ) এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যার ওপরে পানির ছিঁটা দেয়া হচ্ছিলো। হুযূর (সাঃ) সাহাবা (রাঃ)-কে প্রেমভরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সঙ্গীর কী হয়েছে? তারা বল্লেন, (ঐ ব্যক্তি) রোযাদার। আঁ হযরত (সাঃ) বল্লেন, ইহা পুণ্যের কথা নয় যে, তোমরা ভ্রমণে রোযা রাখো। তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌তাআলা প্রদত্ত অবকাশ থেকে সুযোগ গ্রহণ করা উচিত যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব এ অবকাশকে গ্রহণ করো" (সুনানে নিসাঈ কিতাবুস্ সাওম)।

✯... আঁ হযরত (সাল্লাঃ) স্বয়ং ভ্রমণকারীদের রোযা ভাঙ্গাতেন উমরু বিন উম্মিয়া যমরী বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সাঃ)-এর সেবা করার জন্যে এক ভ্রমণে তাঁর সাথে ছিলাম। হুযূর (সাঃ) বল্লেন, "হে আবূ উম্মিয়া! খাবার অপেক্ষা করো", আমি বললাম, হুযূর (সাঃ) আমি তো রোযা রেখেছি। তিনি আদর করে বল্লেন, এদিকে আমার নিকটে এস, তোমাকে বলছি যে, আল্লাহ্‌তাআলা ভ্রমণকারীকে রোযা রাখা থেকে অবকাশ দিয়েছেন এবং অর্ধেক নামাযও তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন" (সুনানে নিসাঈ, কিতাবুস্ সাওম)।

✯...সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম ভ্রমণে রোযা রাখতেন না বরং রোযা রাখা দোষের মনে করতেন।

✯....হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ বলেছেন যে, "রমযানে ভ্রমণকালে রোযাদার (খোদার আদেশ অমান্য করার দিক থেকে) ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ঘরে থেকে (বিনা কারণে) রোযা রাখেনি"(সুনানে ইবনে মাজাহ্)।

✯... মুহাম্মদ বিন কা'আব বর্ণনা করেন যে, রসূল করীম (সাঃ)-এর খাদেম হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর নিকট আমি একবার রমযান মাসে আসলাম, তিনি ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। যান-বাহন তৈরী ছিলো। তিনি খাবার আনিয়ে খেলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইহা কি রসূল করীম (সাঃ)-এর সুন্নত ও রীতি। তিনি বল্লেন, হ্যাঁ। ইহা সুন্নত। এর পরে তিনি ভ্রমণে রওয়ানা দিয়ে গেলেন (সুনানে তিরমিযী)।

✯... সাহাবা কেরামের পরে তাবেঈনদেরও এই রীতি ছিলো যে, তারা ভ্রমণে রোযা রাখতেন না এবং ভ্রমণকারীর রোযা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে থাকতেন।

✯... বিখ্যাত তাবেঈ আবূ ক্বলাবা উন্নতমানের আলেম ছিলেন। এক বিদেশ যাত্রায় তাঁর সাথে কোন এক ব্যক্তি সঙ্গী ছিলেন। যখন খাবার সময় আসলো তখন তিনি বল্লেন, "আমি রোযা রেখেছি।" আবূ ক্বলাবা বল্লেন, "আল্লাহ্‌তাআলা ভ্রমণকারীর অর্ধেক নামায মাফ করে দিয়েছেন এবং ভ্রমণে রোযার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন। এজন্যে তুমি আমার সাথে খাবার খেয়ে নাও এবং রোযা ভেঙ্গে ফেল। সুতরাং ঐ ব্যক্তি তার সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করলো" (সুনানে নিসাঈ, কিতাবুস্ সাওম)।

✯...হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) লেখেন, "আমার নিকট আব্দুল্লাহ্ সানূরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, প্রাথমিক দিকের কথা, একবার রমযান মাসে কোন একজন অতিথি এখানে হযরত সাহেবের নিকট আসলেন। ঐ সময় সে ব্যক্তি রোযাদার ছিলেন। আর দিনের অধিকাংশই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিলো,

বরং সম্ভবতঃ আসরের পরের কথা। হযরত সাহেব (আঃ) তাকে বল্লেন, 'আপনি রোযা ভেঙ্গে ফেলুন', তিনি আবেদন করলেন, 'এখন তো অল্প সময়ই রয়ে গেছে, এখনকি রোযা ভাঙ্গবো?' হুযূর(আঃ) বল্লেন, **"আপনি কি জোর করে খোদাকে সন্তুষ্ট করাতে চান? খোদাতাআলা জোর জবরদস্তিতে নয় আনুগত্যে সন্তুষ্ট হন।** যখন আল্লাহ্ বলেছেন, 'ভ্রমণকারী যেন রোযা না রাখে, তাহলে রাখা উচিত নয়।' এতে তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন" (সীরাতুল মাহদী, প্রথম খণ্ড, ১৭৭ রেওয়ায়াত)।

✯... এভাবে তিনি লেখেন যে,

"হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, একবার লাহোর থেকে কতিপয় বন্ধু রমযানে কাদিয়ান আসলেন। হযরত সাহেবের নিকট খবর পৌঁছলে তিনি কিছু নাস্তা নিয়ে মসজিদে তাদের সাথে দেখা করতে আসলেন। এসব বন্ধু জানালেন যে, তারা সবাই রোযা রেখেছেন। তিনি (আঃ) বল্লেন, 'ভ্রমণে তো রোযা রাখা ঠিক নয়। আল্লাহ্তাআলা প্রদত্ত অবকাশের ওপরে আমল করা দরকার। সুতরাং নাস্তা করিয়ে তাদের রোযা ভাঙ্গালেন" (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৩৭৮ রেওয়ায়াত)।

✯... হযরত মুন্সী যাফর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন যে,

"রমযান মাসে কাদিয়ানে এক বন্ধু বেড়াতে আসলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অন্দর থেকে শরবত চেয়ে আনালেন। তখন ঐ বন্ধুটি নিবেদন করলেন যে, তিনি রোযা রেখেছেন। হুযূর (আঃ) রোযা ভাঙ্গালেন এবং ছ'জন খাদেমকে আদেশ দিলেন যে, মসজিদে আকসার কূয়ার নিকট তাকে নিয়ে যাও এবং তাকে গোসল করিয়ে দাও এবং মাথায় কমপক্ষে ১০০ ঘটি পানি ঢালো। সুতরাং হুযূর (আঃ)-এর নির্দেশ পালন করা হোল। ঐ বন্ধু বলেন যে, যখন তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছিলো তখন তার এ রকম মনে হচ্ছিলো যে, তার শরীর থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। পরের দিন খবর পাওয়া গেল যে, দু'জন ভ্রমণকারী প্রচণ্ড গরম ও পিপাসার কারণে রোযার অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেছে কিন্তু তারা রোযা ভাঙ্গেনি"।

✯... হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হোল যে, ভ্রমণে রোযা রাখার ব্যাপারে আদেশ কী? এতে তিনি (আঃ) বল্লেন,

"কুরআন করীম থেকে তো ইহা জানা যায় যে, 'ফামান কানা মিন্কুম মারীযান আও 'আলা সাফারিন ফা'ইদ্দাতুম্মিন আইয়্যামিন উখার'–অর্থাৎ রোগী ও ভ্রমণকারী যেন রোযা না রাখে। এতে আদেশ নিহিত। আল্লাহ্তাআলা ইহা বলেননি যে, যার খুশী না রাখুক। আমার মতে ভ্রমণকারীর রোযা রাখা উচিত নয়। যেহেতু সাধারণভাবে অধিকাংশ লোক রেখে নেয়, এজন্যে যদি আদেশ পালন মনে করে কেউ রেখে নেয় তাতে দোষ নেই, কিন্তু 'ফা'ইদ্দাতুম্মিন আইয়্যামিন উখার'–এর প্রতিও তাহলে দৃষ্টি দিতে হবে। ভ্রমণে কষ্ট স্বীকার করে যদি কেউ রোযা রাখে তাহলে এতদ্বারা ইহা মনে হয় যেন জোরজবরদস্তি করে খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করতে চায়, আদেশ মান্য করা দ্বারা তাঁকে খুশী করতে চায় না। ইহা ভুল। আল্লাহ্তাআলার আদেশ-নিষেধ পালনের মধ্যেই সত্যিকারের ঈমান নিহিত" (আল্ হাকাম, ২৬-১-১৮৯৯ইং)।

✯... আরও একটি ঘটনায় তিনি (আঃ) বলেন,

"যদি রেলের ভ্রমণ হয়, কোন প্রকারের কষ্ট না হয় তাহলে রেখে নিন, নচেৎ খোদাতাআলা প্রদত্ত অবকাশ থেকে উপকৃত হোন" (আল্ হাকাম, ২৪-১২-১৯০০)।

✯... পুনরায় আরও এক উপলক্ষ্যে হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং ভ্রমণের অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে সে খোদাতাআলার সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করে। খোদাতাআলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, রোগী এবং ভ্রমণকারী রোযা রাখবে না। রোগী সুস্থ হলে এবং ভ্রমণকারীর ভ্রমণ শেষ হলে রোযা রাখবে। খোদার এ আদেশ পালন করা উচিত। কেননা, মুক্তির সম্পর্ক আশিসের সাথে আর নিজের কর্মের জোরে কোন ব্যক্তি মুক্তি লাভ করতে পারে না। খোদাতাআলা ইহা বলেননি যে, অসুখ কম হোক বা বেশী, আর ভ্রমণ দীর্ঘ হোক বা ছোট বরং আদেশটি সাধারণ, আর এর ওপরে আমল করা উচিত। রোগী ও ভ্রমণকারী যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের ওপরে আদেশ অমান্যের বিধি বলবৎ হবে" (আল্ বদর ১৭-১০-১৯০৭ইং)।

কতক রোগ এমনও হয় যে, মানুষ তা নিয়ে নিজের সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকে। এমন লোককে রোগী মনে করা হয় না। আবার এমন লোকও আছে যে, চাকরীর কারণে তার ভ্রমণ করা জরুরী। ইহাকে ভ্রমণ হিসেবে ধরা যায় না। এ ভ্রমণ তো চাকুরীর অংশ। এভাবে কতক রোগ আছে যা নিয়ে মানুষ সমস্ত কাজকর্ম করে থাকে। সেনাবাহিনীর মধ্যে এমন হয় যে, যারা রোগে নিপতিত অথচ সমস্ত কাজকর্ম করে। কয়েকদিনের আমাশার কথাই ধরা যাক না কেন, সব সময়ের জন্যে কাজকর্ম ছেড়ে দেয় না। যদি অন্য কাজের জন্যে সময় করা যায় তাহলে কি কারণে এমন রোগী রোযা রাখবে না? এসব বাহানা কেবল এ কারণেই হয়ে থাকে যে, এসব লোক আসলে রোযা রাখারই পক্ষপাতি নয়। নিঃসন্দেহে ইহা কুরআনের আদেশ যে, ভ্রমণের অবস্থায় এবং এমনিভাবে অসুস্থাবস্থায় রোযা রাখা উচিত নয় আর আমরা এর ওপরে জোর দিই যে, যেন কুরআনের আদেশের অমর্যাদা করা না হয়, কিন্তু এ বাহানা থেকে উপকৃত হয়ে যেসব লোক রোযা রাখতে পারে অথচ রোযা রাখে না বা তাদের কিছু রয়ে গেছে কিন্তু যদি তারা চেষ্টা করে তাহলে ওগুলোকে পুরো করতে পারে অথচ পুরো করার চেষ্টা করে না এমতাবস্থায় তারা তেমনই পাপ করে যেভাবে কেউ রমযান মাসে বিনা কারণে রোযা না রেখে পাপ করে। এজন্যে প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য যে, যেসব রোযা সে অমনোযোগিতার কারণে বা শরীয়ত কর্তৃক সিদ্ধ কারণে রাখতে পারেনি উহা যেন সে পরে পুরো করে" (আল্ ফযল, ১৬-৮-১৯৪৮ ইং)।

অতএব ঐসব লোক যাদের ডিউটিই ভ্রমণ সম্পর্কিত; যেভাবে রেলওয়ে গার্ড, ড্রাইভার, পাইলট, ট্রাভেল এজেন্ট দৈনন্দিন নিজেদের কাজে ভ্রমণ করেন, এরা সবাই মুকীমদের অনুরূপ এবং রমযানের রোযা রাখবে।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ২৬ ডিসেম্বর '৯৭ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে।)

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা

(৩য় ও শেষ কিস্তি)

ওসীয়্যতের নতুন বিধানের প্রকাশ ঃ

"আল্ ওসীয়্যত" সেই শিক্ষা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে দিয়েছেন। তিনি (আঃ) "আল্ ওসীয়্যত" কেতাবে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক বিষয় যা ইসলামের সম্প্রচারের সাথে জড়িত তা এবং যা এখন পূর্বাহ্নে সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তার উপর এ টাকা খরচ করা যাবে। এর পরিষ্কার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ ধরনের বিষয়াবলী ভবিষ্যতে উপস্থিত হবে যা এখন বর্ণনা করা সম্ভব নয় এবং খুব শীঘ্রই ঐ সময় উপস্থিত হবে যখন পৃথিবী চিৎকার করে বলবে যে, আমাদের এক নতুন বিধান দরকার, তখন চারিদিক থেকে এই আওয়াজ উঠবে যে, এসো আমরা তোমাদেরকে নতুন বিধান দেবো। রুশ বলবে যে, এসো, আমি তোমাদের নতুন নেযাম দেবো, হিন্দুস্তান বলবে যে, এসো, আমি তোমাদেরকে নতুন বিধান দেবো, জার্মানী এবং ইটালী বলবে যে, এসো, আমি তোমাদেরকে নতুন বিধান দেবো, আমেরিকা বলবে যে, আমার কাছে এসো, আমিই তোমাদেরকে নতুন বিধান দেবো। তখন আমার স্থলাভিষিক্ত কাদিয়ান থেকে বলবে যে, নতুন বিধান তো "আল্ ওসীয়্যত" বর্ণিত, মজুদ আছে। পৃথিবী যদি মঙ্গল এবং উন্নতির রাস্তায় চলতে চায়, তাহলে এটাই সেই রাস্তা। এবং এটা হলো "আল্ ওসীয়্যত" কেতাবে পেশ করা নতুন নেযাম যা পৃথিবীতে জারী করা হবে।

ওসীয়্যতের সম্পদের মাঝে এতীম মিস্কীন এবং নও মুসলিম, যারা অর্থ সম্পদের কষ্টের মাঝে দিনাতিপাত করছে তাদেরও হক আছে ঃ

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, ঐ অর্থ সম্পদে এতীমদের এবং মিস্কীনদেরও হক আছে যাদের জীবন ধারণের যথেষ্ট উপায় অবলম্বন নেই (শর্ত ২)। অতঃপর আবার বলছেন, আঞ্জুমানের জন্যও ইহা জায়েয হবে যে, তারা ঐক্যমতের ভিত্তিতে এই টাকা-পয়সা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে এই সম্পদের উন্নতি সাধন করে (জমিমা শর্ত নং ৯)। অর্থাৎ এই সম্পদ দ্বারা ব্যবসায় করাও জায়েয হবে। এবং তোমাদের জন্য এরও অনুমতি আছে যে, লোকদের থেকে তাদের সম্পদের ১/১০ অংশ অথবা ১/৮ অংশ অথবা ১/৫ অংশ অথবা ১/৩ অংশ গ্রহণ কর এবং পরে ব্যবসায় এ সম্পদকে আরো বৃদ্ধি কর।

এই নতুন বিধানের বাইরে যারা থাকবে তাদের ঈমানের ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য ইহা ঈমানের এক পরীক্ষাস্বরূপ যেন সে ওসীয়্যতের নেযামের মধ্যে দাখিল হয় এবং আল্লাহ্তাআলার খাস ফযল লাভ করে। শুধু মুনাফিকরাই এই নেযাম থেকে বাইরে থাকবে। মোটকথা কোন জবরদস্তি নেই কিন্তু সাথে সাথে হুযূর (আঃ) ইহাও বলে দিয়েছেন যে, এর মাধ্যমে তোমাদের ঈমান পরীক্ষা করা হবে। যদি তোমরা বেহেশ্ত পেতে চাও তাহলে তোমাদের জন্য ইহা জরুরী যে, তোমরা এই কুরবানী কর। তবে হ্যাঁ, যদি তোমাদের হৃদয়ে বেহেশ্তের কদর এবং মূল্য না থাকে তাহলে তো তোমাদের মাল তোমাদের কাছে রেখে দাও, তোমাদের মালের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই।

কমিউনিজম এবং ওসীয়্যতের মাধ্যমে গৃহীত সম্পদের মাঝে পার্থক্য

অতঃপর দেখ, কমিউনিজম লোকদের কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয় কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, যদি কেউ মুর্তাদ হয়ে যায় তবে তার মাল তাকে ফিরিয়ে দাও, কেননা, খোদা কারো সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ্র কাছে এই ধরনের সম্পদ ঘৃণিত এবং পরিত্যাজ্য (জমিমা শর্ত নং ১২)। দেখ, কত আজিমুশ্বান পার্থক্য। দুনিয়া যে নতুন নেযাম পেশ করছে সেখানে লোকদের কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি করে সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে নতুন নেযাম পেশ করছেন সেখানে ঐচ্ছিক কুরবানীর উপর জোর দেয়া হচ্ছে এবং তিনি (আঃ) বলেছেন, যদি কেউ মুর্তাদ হয়ে যায়, তাহলে তার মাল তাকে ফিরিয়ে দাও, কেননা এ ধরনের মাল পরিত্যাজ্য এবং ইহা আমাদের কাছে রাখার উপযুক্ত নয়।

বলশেভিজম বা কমিউনিজম এর মোকাবিলায় আল্ ওসীয়্যতের সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করা যায় ঃ

এই নীতির উপর আমরা যদি ভিত্তিস্থাপন করি, তাহলে কমিউনিজম যে উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তাদের হাত রক্তে রঞ্জিত করেছে এর পরেও আংশিকভাবেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পেরেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পেয়ার ও মহব্বতের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণভাবে সাধন করতে পেরেছেন। কমিউনিজম কী বলে? এটাইতো যে, ধনীদের কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নাও যেন গরীবদের মাঝে খরচ করা যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ সম্পদই ইসলামী উদ্দেশ্য মোতাবেক তাঁর সময়ের প্রয়োজনের চাহিদা মোতাবেক ঐ সম্পদকে প্রেম-প্রীতির মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, তোমরা কমপক্ষে নিজ নিজ সম্পদের ১/১০ অংশ দান কর যা এতীম মিস্কীনদের উপর খরচ করা হবে এবং ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করা হবে। এই ওসীয়্যতের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক মুসী স্বীয় সম্পত্তির ১/১০ অংশ থেকে ১/৩ অংশ পর্যন্ত নিজ মর্জি মোতাবেক খুশী হয়ে পরকালের ফায়দাকে সামনে রেখে ইসলাম ও মানবজাতির সেবার জন্য দান করে।

সারা দুনিয়ার মানুষ যদি আহমদী হয়ে যায় তাহলে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হবে

যদি সারা দুনিয়ার মানুষ আহমদী হয়ে যায় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সারা দুনিয়াকে এই দাবী পেশ করবেন যে, তোমাদেরকে খোদাতাআলা পরীক্ষা করতে চান। যদি তোমরা সত্যিকারের মু'মিন হও, যদি তোমার বেহেশ্ত লাভ করতে চাও, যদি তোমরা খোদাতাআলার সন্তুষ্টি হাসেল করতে চাও এবং তাঁকে রাজী করতে চাও, তাহলে তোমাদের সম্পত্তির ১/১০ অংশ হতে ১/৩ অংশ পর্যন্ত ইসলাম এবং ইসলামের বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল প্রচার করার জন্য দিয়ে দাও। এভাবে সারা দুনিয়ার সম্পদ জাতীয় সম্পদে পরিণত হবে এবং কোন জোর-জবরদস্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া ইসলামী কেন্দ্র এক প্রজন্মেই সারা দুনিয়ার সম্পদের ১/১০ অংশ হতে ১/৩ অংশের মালিক হয়ে যাবে। এই জাতীয় সম্পদ থেকে সমস্ত গরীবদিগকে সাহায্য সহায়তা করা যাবে।

কয়েকটি প্রজন্মেই সমস্ত আহমদীদের সম্পদ নেযামে আহ্‌মদীয়তের হস্তগত হয়ে যাবে ঃ

অতঃপর স্মরণ রাখো যে, এই ওসীয়্যত শুধু প্রথম প্রজন্মের জন্যই নয় বরং দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্যও বটে এবং তাদের কাছেও একই ধরনের কুরবানীর দাবী রাখে। এবং যেহেতু ওসীয়্যত দুনিয়ার সামনে বেহেশ্‌ত পেশ করে সুতরাং পরবর্তী প্রজন্ম একে কীভাবে অস্বীকার করতে পারে? ফলতঃ দ্বিতীয় প্রজন্ম নিজেদের খুশী অনুসারেই বাকী সম্পদ ১/১০ অংশ থেকে ১/৩ অংশ জাতীয় প্রয়োজনে দান করে দেবে এবং অতঃপর তৃতীয় প্রজন্ম এবং এরপর চতুর্থ প্রজন্ম একইভাবে দান করে যাবে এবং এভাবে কয়েক প্রজন্মে আহমদীদের সমস্ত সম্পত্তি নেযামে আহমদীয়তের হস্তগত হয়ে যাবে। মনে কর সমস্ত দুনিয়া আহমদী হয়ে গেছে, তাহলে এর ফল কী দাঁড়াবে জান? এর ফল এই দাঁড়ায় যে, সবাই খুশী হয়ে নিজেদের সম্পদ জাতীয় প্রয়োজনে দিয়ে দেবে এবং তার ব্যক্তি-সত্তাও নষ্ট হবে না এবং পারিবারিক জীবনও নষ্ট হবে না এবং অতঃপর লোকেরা নিজেদের জন্য এবং সন্তান-সন্ততির জন্য আরো সম্পদ আহরণ করবে এবং পরে নিজেদের খুশী মোতাবেক ১/১০ অংশ থেকে ১/৩ অংশ পর্যন্ত জাতীয় প্রয়োজনে দিয়ে দেবে। ফলে এই নতুন সম্পদ কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত হবে। এভাবেই এই সিলসিলাহ্‌ চলতে থাকবে। নমুনাস্বরূপ এভাবে বুঝার চেষ্টা কর ঃ যদি কেউ ওসীয়্যত করে আর তার ১০০ টাকা থাকে এবং সে ১/৫ অংশ ওসীয়্যত কর্তৃক থাকে তাহলে ২০ টাকা জাতীয় সম্পদে চলে যাবে এক ৮০ টাকা তার কাছে থাকবে যা তার ছেলে পাবে। অতঃপর যদি তার ছেলে ৮০ টাকার ১/৫ অংশ ওসীয়্যত করে তবে ১৬ টাকা জাতীয় ফান্ডে চলে যাবে। মুটামুটি ৩৬% ভাগ জাতীয় ফান্ডে যাবে এবং ৬৪% ভাগ তার কাছে যাবে। অতঃপর তার ছেলে যদি ৬৪ টাকার ১/৫ ভাগ ওসীয়ত করে তাহলে প্রায় ১২ টাকা আবারো জাতীয় ফান্ডে এসে যাবে। এভাবে মোট ৪৮ টাকা জাতীয় ফান্ডে এসে যাবে এবং ঐ বংশের কাছে আর ৫২ টাকা থাকবে। এরপরও তাদের ছেলে ঐ ৫২ টাকার ১/৫ অংশ যদি ওসীয়্যত করে দেয় তাহলে আরো ১০ টাকা তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। এভাবে জাতীয় ফান্ডে ৫৮% এসে যাবে এবং ঐ বংশের কাছে মাত্র ৪২% থাকবে। মোট কথা হচ্ছে এই যে কম্যুনিজম, এর মাধ্যমে জোর-জবরদস্তি করে এই উদ্দেশ্য হাসেল করা হয়। অপর পক্ষে যদি ওসীয়্যতের নেযাম সম্প্রসারিত হয় তাহলে একই উদ্দেশ্য সাধিত হবে, ঝগড়া-ফাসাদ এবং রক্তপাত হবে না, আপোষে, মিল-মহব্বতের মাধ্যমেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। পৃথিবীতে কোন অন্নহীন এবং বস্ত্রহীন দেখা যাবে না। কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই জাতীয় ফান্ডে সমস্ত পৃথিবীর টাকা পয়সা এসে যাবে এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যও নষ্ট হবে না।

- মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত

কবিতা

পুণ্য-গাঁথা

স্মরি আজিকে মীর ওসমান আলী,
সরাইল আহমদীয়া জামাত প্রধান,
কী অভিমানে, কাউকে না বলি'
ঊর্দ্ধ জগতে করলেন গমন?
কোথায় সেই আহমদী,
কোথায় সেই মুসলমান।
মসীহী তেজোদ্দীপ্ত,
বুকে ভালোবাসা অফুরান।
আমি খুঁজি সেই সচ্চিদানন্দ
সত্যে উৎসর্গীত প্রাণ।
ভুবনে ভুবনে খুঁজি আমি,
সেই সত্যদ্রষ্টা, সত্যপ্রাণ।
হাক্কানি, স্পষ্টভাষী,
জালিমদের
তরে বজ্রবান।
প্রতি জলসায় দেখেছি তাঁকে,
বিলাইতে, জিন্দা জীবন,
জিন্দা প্রাণ।
কোথায় সেই ...
..... সত্য দ্রষ্টা সত্যপ্রাণ।
খুঁজি তাঁকে তারায় তারায়,
খুঁজি কুঞ্জবনে, দিনমান,
খোদা বেহেশ্‌তের দরজায়,
তব মহিমায় দিও তাঁর
সাক্ষাৎ দান।
কোথায় সেই ...
সত্য দ্রষ্টা, সত্য প্রাণ।

- মির্যা আলী আকন্দ

ধন্য জীবন

আল্লাহ্‌ তোমার থাকলে কাছে
শয়তান র'বে দূরে,
অন্ধকারেও দেখবে পথ
প্রভুর ঐশী নূরে।

চলবে যখন সত্য পথে
আসবে শত বাঁধা,
আল্লাহ্‌তাআলা থাকলে সাথে
রুখবে তোমায় কেবা?

শয়তান যখন হৃদয় মাঝে
দিবে কুমন্ত্রণা
বাঁচার তরে প্রভুর কাছে
চাইবে তখন পানাহ্‌।

আল্লাহ্‌ যদি থাকে সহায়
পাবে না দুঃখের ছোঁয়া,
হৃদয় মাঝে বইবে তোমার
প্রভুর প্রেমের হাওয়া।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিশ্বজগৎ
তনু, দেহ-মন;
প্রভুর পথে চলবে সদা
কর এই পণ।

আসবে যখন প্রভুর সনে
মিলনেরই দিন
তোমায় বরণ করতে তখন
বাঁজবে ঐশী বীণ।

ফিরিশ্‌তারা বলবে সালাম
জান্নাতের দরজা যাবে খুলি'
ধন্য সে দিন তোমার জীবন
প্রভু হবেন ওলী॥

- নাসের আহমদ আনসারী

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর ভালবাসা লাভের জন্যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করা যেখানে একটি অতি বড় পুণ্য ও মঙ্গল এবং দেশেরও মঙ্গল লাভের একটি বড় প্রত্যাশা সেখানে এটা একটি আর্থিক ইবাদতও বটে।

যে জাতি মজুদ্‌দারী ও ধন-সম্পদ জমা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় আর জাতীয় প্রয়োজন এবং জণকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে উদার মনে ব্যয় করতে ইতস্ততঃ করে, ধ্বংস ও বিনাশ এর দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে। ফিৎনা-ফাসাদ এবং নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা তাদের ললাটের লিখন হয়ে যায়। এতেও কৃপণ জাতি হাবুডুবু খেতে থাকে। মানুষ যে ধন-সম্পদ লাভ করে তা আল্লাহ্‌ই দিয়ে থাকেন। আর এটা তাঁর আমানত। আল্লাহ্‌তাআলা যদি এ আমানত থেকে কিছু নিতে চান আর বান্দাকে তাঁর দেয়া সম্পদ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করতে বলেন তাহলে আনন্দ ও পূর্ণ প্রশান্তির সাথে আল্লাহ্‌তাআলার এ আদেশকে মান্য করা এবং তাঁর পথে ব্যয় করা মানুষের বড়ই সৌভাগ্য ও তাঁর পক্ষ থেকে আরও কল্যাণ-প্রার্থী হওয়ার সুনিশ্চিত ও অকাট্য মাধ্যম।

আল্ খলক্বু আয়ালুল্লাহ্ (সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবার)-এর অধীনে জীবনের দিক থেকে সব মানুষ আল্লাহ্‌র সকাশে একই রকম অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী। আর বিশ্বের সম্পদ-রাজিতে সবাই একই রকম অংশীদার। যদিও নিজ নিজ উপায় উপকরণ এবং সামর্থ্যের দিক থেকে সকলের মালিকানার পরিমাণ এক নয়। বরং অবস্থার প্রেক্ষিতে কারও কারও নিকট সম্পদ বেশি থাকে এবং কারও নিকট কম। একজন রুজি-রোজগারের পদ্ধতি ভালভাবে জানে। আবার অন্য একজন এ ব্যাপারে আনাড়ি বা অদক্ষ। উপায় উপকরণও নেই। কিন্তু এ পার্থক্যের কারণে দুর্বল, উপায়হীন ও নিঃস্ব নিজ আসল অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। কুরআন করীমের আয়াত **ওয়া ফী আমওয়ালিহিম হাক্কুল্লিস্‌সায়িলি ওয়াল মাহ্‌রূম** (আর এদের ধন-সম্পদে যারা চায় তাদের অধিকার ছিলো আর যারা চাইতে পারে না তাদেরও অধিকার ছিলো। সূরা যারিয়াত ঃ ২০)-এ এই তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। অতএব বিত্তবানদের কর্তব্য, তাদের সম্পদে অন্যদের যে অধিকার রয়েছে তা যেন সানন্দে ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আদায় করে। এতে তাদের নিজেদের মঙ্গল ও তাদের তহবিলে যে অর্থ আছে এর প্রকৃত সংরক্ষণের রহস্য নিহিত। দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি নির্দেশ, তারা অন্যদের ধন-সম্পদের প্রতি ঈর্ষা, লালসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার নিয়্যতে যেন না তাকায়। আর অবৈধ পন্থায় যেন হাতিয়ে নেয়ার ও এর ওপরে শক্তিপ্রয়োগে দখল করার পথ অবলম্বন না করে। অন্যদিকে বিত্তবানদের প্রতি নির্দেশ তারা যেন সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন, খাবার, পোষাক, বাসস্থান প্রভৃতির সমস্যায় এদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে না দেয়, যা এতই করুণ যে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এতে তাদের সংকীর্ণতা ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অতএব যদি ধনী ও বিত্তবানরা চায় যে, দরিদ্ররা আল্লাহ্‌তাআলার এ আদেশ পালন করুক অর্থাৎ অন্যের ধন-সম্পদ জবরদখল না করার যে নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তাহলে তাদেরও (অর্থাৎ ধনীদের) কর্তব্য তারাও আল্লাহ্‌তাআলার এ নির্দেশ পালন করে এবং নিষ্ঠার সাথে এর প্রতি কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়। পৃথিবী থেকে দারিদ্র ও পরমুখাপেক্ষিতা দূর করার লক্ষ্যে এবং একে নিম্নতম পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌তাআলার পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে তাদেরকে সে নির্দেশই দেয়া হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সবচে' বড় সমস্যা হলো ধন-সম্পদের অসম বন্টনের বিষয়টি। একটি গোষ্ঠী যেমন প্রাচুর্যের মাঝে গড়াগড়ি খাচ্ছে তেমনি একটি গোষ্ঠী চরম দারিদ্রতা ও নিঃস্ব অবস্থায় কালাতিপাত করছে। এ আকাশচুম্বি ব্যবধানের কারণে উভয় গোষ্ঠীর মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে। আর এভাবেই এদের মাঝে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের স্পৃহা বারে বারে অস্থিতিশীল অবস্থা ও বিপ্লবী স্লোগানের শিকারের কারণে পরিণত হচ্ছে। বিশ্ব এখন পর্যন্ত এথেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। এক দিকে পুঁজিবাদীরা নিজেদের পুঁজির জোরে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছে আর অন্য দিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের পরিশ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য মূল্য পাওয়ার চেষ্টায় ধূঁকে ধূঁকে মরছে আর তাদের সঠিক পরিশ্রমের মূল্য তারা পাচ্ছে না।

ধনী-দরিদ্রের এ ব্যাপক সমস্যা সমাধানের উত্তম মাধ্যম হলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের অভ্যাস থেকে এ আবেগ জাগ্রত হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে যে, প্রত্যেকের সঠিক অধিকার লাভ করা আবশ্যক। আর কাউকে লুট-তরাজের অধিকার ও বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি হতে দেয়া উচিত নয়।

ইসলাম যেখানে (আল্লাহ্‌র পথে) অর্থ ব্যয়ের ভরপুর আহ্বান জানিয়েছে সেখানে এর উদ্দেশ্যও নির্ধারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ব্যয় করেন যিনি তার উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ। এর পেছনে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য কাজ করে না। নইলে আত্ম-তুষ্টি, লালসা, অবৈধ আয়ের প্রলোভন আর অন্যদের প্রতি অনুগ্রহের কথা বলে অহমিকাপূর্ণ কুঅভ্যাস থেকে মুক্তি লাভ কষ্টকর হবে। আর সেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না যার জন্যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করতে এতটা তাগিদপূর্ণ আহ্বান জানানো হয়েছে।

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনাকে স্থায়িত্ব দান করুন আর একে অনায়াসে প্রবহমান রাখার জন্যে ইসলাম স্বল্পে-তুষ্টতা ও আনুষ্ঠানিকতামুক্ত সাদাসিদা জীবন অবলম্বন করার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে। আর অপচয়ের পথ পরিহার-**লাতুসরিফু ইন্নাহূ লা ইউহিব্বুল মুসরিফীন** - তোমরা অপচয় করো না; নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) অপচয়কারীদেরকে পসন্দ করেন না (সূরা আন আনআম ঃ ১৪২)-করার নির্দেশ দিয়েছে। কেননা, আনুষ্ঠানিকতা বা লৌকিকতার পথ অসংখ্য। মানুষ যদি এতে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে কারুনের ধন ভান্ডারেও কুলোবে না। আর ব্যক্তিগত ব্যয় এতই বেড়ে যেতে থাকে যে, মানুষ লৌকিকতার শিকার হওয়ার দরুন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের জন্যে তার প্রাণে কীভাবে উৎসাহ সৃষ্টি হবে আর সেজন্যে সে কীভাবেই বা সাহস দেখাবে?

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের শ্রেণীভেদ ঃ

ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের অপর নাম সদকা। আর সদকার কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে, যেমন ঃ

(১) জাতীয় ও সার্বজনীন প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করা। এর জন্যে প্রয়োজন একটি শর্ত। যদি সার্বজনীন ক্ষয়-ক্ষতি দেখা দেয় আর ধর্মীয় নেতৃত্ব থেকে দাবী করা হয় যে, যার কাছে যা

আছে তা নিয়ে আসুক যেন এ ক্ষয়-ক্ষতির মোকাবেলা করা যায়। তখন সকলের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, যার কাছে যা আছে তা নিয়ে যেন উপস্থিত হয়। ঐশী নির্দেশ হলো ঃ **ইন্নাল্লাহাশ্‌তারা মিনাল মু'মিনীনা আনফুসাহুম ও আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ্** অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিনের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ এ অঙ্গীকারের বদলে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জান্নাত লাভ হবে (সূরা তাওবা ঃ ১১)। এতে এ তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) সঞ্চয় ও প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ থেকে ব্যয় করা। এর আবার দু'টি শ্রেণী রয়েছে ঃ (ক) এ খরচ, যা মানুষ স্বেচ্ছায় নিরূপণ করে। যেমন ঐচ্ছিক সদকাসমূহ যেসব মানুষ অভ্যন্তরীণ তাক্‌ওয়ার সিদ্ধান্তের ওপরে ছেড়ে দেয়। অনুগ্রহের বদলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, উপহার ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের খাতিরে বিভিন্ন প্রকার খরচও ঐচ্ছিক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) লাযেমী বা অবশ্য দেয় চাঁদা, যা একজন মুসলমান সাধারণত অবলম্বন করতে বাধ্য যেমন সামগ্রিক অবশ্য দেয় চাঁদাগুলো যা সাধারণ সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও ইসলামের প্রচার কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে আহূত মজলিসে মুশাভিরাত (পরামর্শ সভা) প্রস্তাব করে এবং যুগ-খলীফা এর অনুমোদন দেন।

(গ) সরকারের পক্ষ থেকে প্রবর্তিত ট্যাক্সসমূহ এর অধীনে আসে।

(ঘ) এতদ্ব্যতিরেকে নিকটবর্তী লোকদের জন্যে ব্যয়, সেবার দায়িত্ব পালন, ঈদুল ফিতরের সদকা, ফিদিয়া, কাফ্‌ফারা ও নযর বা মানত সম্বন্ধীয় ব্যয়ও অবশ্য দেয় চাঁদার অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) আল্লাহ্‌র পথে একটি আবশ্যিক খরচ এর বিশেষ ও পরিভাষাগত নাম যাকাত। আর এ ব্যয়ের বিস্তারিত কথা এখন দৃষ্টিপটে রয়েছে ঃ

যাকাত সঞ্চয় থেকে আবশ্যিক খরচের মাঝে সবচে' বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কেননা, এটা সেই ব্যয় যা আল্লাহ্‌র পথে নিম্ন পর্যায়ের ব্যয়। এটা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে প্রত্যেক 'সাহেবে নিসাব' মুসলমানের জন্যে ব্যয় করা ফরয। সমাজের এটা প্রয়োজন হোক বা না হোক অবশ্যই এ ব্যয়টি জরুরী। এ কারণেই যাকাতের আদায় সেই সময়ও প্রয়োজনীয় হবে যখন সমাজের সব রকমের জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন অন্য মাধ্যমে সহজে পূরণ হতে থাকবে। কেননা, এ অর্থ ব্যয় প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে যেন আল্লাহ্‌র পথে ব্যক্তির ব্যয় করার অভ্যাসটা চিরস্থায়ী হয়। সংকীর্ণতা, কৃপণতা ও ঈর্ষার মূলোৎপাটন হতে থাকে। আর ঐশী বাণী **কাইলা ইয়াকূনা দূলাতাম্ বায়নাল আগনিয়া-ই মিনকুম** (সূরা হাশ্‌র ঃ ৮) অর্থাৎ যেন এটা তোমাদের বিত্তশালীদের মাঝে চক্রাকারে আবর্তিত না হয়- এর উদ্দেশ্য সাধিত হয় আর সমাজ জালেম ও কৃপণ ব্যক্তিদের শোষণ থেকে সুরক্ষা লাভ করে। (চলবে)

(ফিকাহ্ আহমদীয়া, পৃষ্ঠা নং ৩৫৬-৩৫৮)

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

কবিতা

পূর্ণ কর

আজকে নূরের বান ডেকেছে আল্ কদরের রাতে
আশীষ ধারা প্রবহমান দয়ার সাথে সাথে,
'কুন' বলে দাও হবে 'ফায়াকুন' আরশ হ'তে বসে
কোন্ কারিগর গড়লো আরশ নূরের স্রোতে ভেসে?
তুমি আমায় ফকীর করে আপন হাতে ভিখ্ দিলে
দয়ার চাওয়া চাইলে, যবে হৃদয় কুসুম দল মেলে,
করুণ মুখে-কান্না চোখে তোমার যখন ডাক পড়ে
আরশ ছাড় মাধব বনে দৌড়ে আস তাঁর দ্বারে।
আজো তোমায় চিনে নি যে, দুর্দশাতে রাত কাটে
ডাকলে ডাকুক জব্ মিলে না ফুল ফোটে না তার বাগে,
ক্ষমার প্রসাদ বাট তুমি সেই রাতেরই এক ভাগে
পেল যেজন ধন্য হলো জীবন-নদে বান ডাকে,
ধূপ কাঠিতে ডুব দিয়ে যে আতর বাসে ভাব আনে
কেউ না জানুক জান তুমি ছুটছে যে সে কাঁর পানে।
চাঁদের আলোয় পথ দেখিয়ে পুণ্য স্থানে যারে
চিনলে তুমি সেই জনারে চিনলো না কেউ তারে,
উদর ভরে জর্দা খেয়ে গাইলে ঈদের গান
পাবি না তুই পাড়ে ভিড়ার নূরের সাম্পান।
এক রাতেরই পুণ্য যোগে হাজার হয়ে রয়-
মুহাম্মদের (সঃ) গোলাম ছাড়া আর কী পরিচয়!!
যবেহ্ কর খোদার নামে আত্মা নামের বকরীটা
মুহাম্মদের চরণে দেখ্ বেহেশ্‌তের সেই তখতিটা।

- **মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়**

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

হাসিতে তোমার ঝরিত মুক্তা তাতেই কি হলো বলা।
সহস্র ফুলের হাসিতে যেন একটি ফুলের মালা।
ঝর্ণাধারা আঁছড়ে পরে শ্বেত পাথরের বুকে,
তেমনি হাসি রং চড়া কঁচি কাঁচার মুখে।
তোমার হাসির পান্থশালা অনেক দূরের পথে,
যেখানে পথিক হাঁফ ছাড়িত ক্লান্ত পথ রথে।
চাঁদ কি তেমন হাসতে পারে ফুলের মুখে মুখে
যেমনি হাসির রং চড়াও মোদের দুঃখ-সুখে
ধরার মাটি চষিয়ে ফিরিলে অতি সন্তর্পণে,
মানবতার বীজ ছড়িয়ে সাজালে শস্য বনে,
বিশ্ব-শক্তি ব্যস্ত যখন আপন স্বার্থ নিয়ে।
বিশ্ব মেঘের ফানুস যখন উড়ছে গগনময়,
প্রেমের জলে করলে সরস মরুপলি সর্বময়।
মুহাম্মদের (সঃ) জীবন ছিল তোমার গানের বীণা,
আল্লাহ্-প্রেমের মধুর সুরে বাজত যাহা কিনা,
তোমার কথার ফুল ঝরিত জনতার মজলিসে,
নীরবে বসে শুনত সবাই সানন্দ সাগ্রহে।
তোমার চলার স্টাইলটা ছিল রাজাধিরাজ যেন
যাচ্ছে ধেয়ে বিশ্ব জয়ে অসম সাহস লয়ে।

- **আবুল হাসান**

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সু-সংবাদপ্রাপ্ত সন্তান
হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব

মূল ঃ হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ)

[চারটি ইলহাম প্রিয় মিঁয়া শরীফ আহমদ সাহেবের ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য নাযেল হয়েছে। কিন্তু এটাও অসম্ভব নয় যে, পরবর্তীতে তাঁর বংশধরদের মাঝে এ সব ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু বাহ্যিক দিক প্রকাশ পায়]

(হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের এক গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এটা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর ১৯৬২ সালের ২রা জানুয়ারী দৈনিক আল্ ফযলে প্রকাশিত হয়। পাঠকদের খেদমতে এটা পেশ করা হ'ল।)

"প্রিয় শরীফ আহমদ সম্পর্কে 'মরহুম' শব্দ লিখতে গিয়ে (যদিও এটি বাস্তব ঘটনা এবং দোয়া করি) হৃদয়ে বিদ্যুতের মত ধাক্কা লাগে। মন ও বাস্তবতাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে চায় না। কিন্তু বাস্তব তারপরও বাস্তব। আর এ এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। আমাদের পাঁচ ভাই -বোনের শিকল থেকে মাঝখানের কড়ি, যার একদিকে দুই ভাই আর অন্যদিকে দুই বোন আছে এ শিকল থেকে কেটে পরকালে পৌঁছেছে (ফা ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

প্রিয় মিঁয়া শরীফ আহমদ সাহেব অনেক দীর্ঘ রোগ ভোগ করেছেন। গত ২০/২১ বছর ব্যাপী লম্বা সময়ে তাঁর ওপর এমন অবস্থা এসেছে, মনে হয়েছে তাকে টেনে নেয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ ইলহাম আম্মারাল্লাহু আলা খিলাফিত্তাওয়াক্কু বার বার পূর্ণ হতে দেখা গেছে। "খোদাতাআলা তাকে তাওয়াক্কু অর্থাৎ বাহ্যিক অবস্থা" এর বিপরীতে বয়স দেবেন এটি একটি বাস্তবতা যে, মিঁয়া শরীফ আহমদ সাহেবের ওপর গত বিশ/বাইশ বছরে বার বার রোগ এরূপভাবে আক্রমণ করেছে যে, অনেক বার বাহ্যিকভাবে নৈরাশ্য দেখা দেয়। কিন্তু যে পর্যন্ত না নির্ধারিত ক্ষণ এসে যায় খোদাতাআলা তাকে বাহ্যিক অবস্থার বিপরীতে বাঁচান। এ থেকে কোন আদম সন্তান বাঁচতে পারে না।

মনে রাখা উচিত, সেই ইলহামে যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে দীর্ঘ বয়সের কোন উল্লেখ নেই। (বস্তুত ছেষট্টি বছর বয়স কোন কম বয়স নয়) কেবল মাত্র বাহ্যিক অবস্থার বিরুদ্ধে বয়স পাওয়ার উল্লেখ আছে। আর বয়স প্রিয় শরীফ আহমদ সাহেব পেয়েছেন। বস্তুত বার বার পেয়েছেন। খোদার কালামে প্রায়শ কিছু না কিছু গোপান আবরণ থাকে। এ আবরণ থাকার জন্য অবশ্যই অনেকে বাহ্যিকভাবে মনে করত যে, মিয়াঁ শরীফ আহমদ অনেক দীর্ঘ জীবন পাবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খোদার ওহীতে দীর্ঘ জীবন পাওয়ার কোন উল্লেখ ছিল না। কেবলমাত্র বাহ্যিক অবস্থার বিপরীতে জীবন পাওয়ার উল্লেখ ছিল। খোদার এ ভবিষ্যদ্বাণী বিস্ময়করভাবে পূর্ণ হয়েছে। এ শব্দগুলোর ওপর গভীরভাবে চিন্তা করলে এক আধ্যাত্মিক আনন্দ পাওয়া যায়। হৃদয় এ ঈমান পূর্ণ হয় যে, খোদা সত্য। খোদার কালাম সত্য। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খোদার সত্য মা'মুর ও প্রেরিত পুরুষ।

প্রিয় মিঁয়া শরীফ আহমদ সাহেবের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কিছু বিষয় সাদৃশ্য ছিল। এ সাদৃশ্য শারীরিক গঠনের দিক থেকে এবং চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকেও। শারীরিক গঠনের দিক থেকে তো তার গঠন, অবয়ব, আকৃতি এবং রং ঢং অন্যান্য ভাইদের থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। যারা তাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখেছে এরূপ সকলে তা অনুভব ও সনাক্ত করতে পারত। তার জানাযার সময় অনেক বন্ধু নিজেই আমাকে বলেছে, তার আকৃতি অবয়ব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে অনেক মিলে। আর এ সাদৃশ্য মৃত্যুতে আরও বেশি সুন্দর হয়। চারিত্রিক ও রূহানী দিক দিয়েও আমাদের মরহুম ভাইয়ের কিছু বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে বিশেষ মিল ছিল। উদাহরণস্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় কিংবা পরামর্শ দেয়ার সময় তাঁর বিচার খুব ভারসাম্যপূর্ণ ও সঠিক হ'ত। সে না তো তার এক ভাইয়ের মত মহিমামন্ডিত শান রাখতো (বস্তুত এ মর্যাদা খোদার এক ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ছিল) আর না তার অন্য ভাইয়ের মত, যার নম্রতা ও অসহায়ত্বকে অনেকের কাছে দুর্বলতার কারণ বলে মনে হতে পারত। বস্তুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মত তাঁর প্রকৃতির মাঝে এক সূক্ষ্ম বিনয় পাওয়া যেত। ক্ষমা ও অনুকম্পা দেখানোর সময় তিনি মোমের মত নরম হয়ে যেতেন। যা সব কিছু যাওয়ার রাস্তা করে দিত। কিন্তু সঠিক শাস্তি দেয়ার সময় তিনি এক মরু প্রান্তরের মত দৃঢ় থাকতেন। যাকে কোন আবেগ বা চিন্তা নিজের স্থান থেকে কাঁপাতে পারত না। আর প্রকৃতির মাঝে অত্যন্ত সরলতা এবং দুস্থদের সেবার মনোভাব ছিল। কি আশ্চর্য যে, তার এ শারীরিক ও চারিত্রিক সাদৃশ্যের দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ ইলহামে ইঙ্গিত আছে- "এখন তুমি আমার স্থানে বস আর আমি যাচ্ছি"। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাহ্যিক ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পর পরই তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন নি। কিন্তু রূপকভাবে এ ইলহামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তা-ই বোঝা যায় দিকে ওপরে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রিয় মিঁয়া শরীফ আহমদ সাহেব একবার আহমদীয়া জামাতের নেযামে কাযী মনোনীত হন। হাইকোর্টের বর্তমান (১৯৬২ সালের) বিচারক মোহতরম শেখ বশীর আহমদ সাহেব তাঁর সাথে কাযী ছিলেন। শেখ সাহেব বলেন, "এ সময়ে আমি মিঁয়া শরীফ আহমদ সাহেবকে খুবই দৃঢ় ও উত্তম বিচারক হিসেবে পেয়েছি। তিনি তাড়াতাড়ি প্রকৃত সত্যকে পেয়ে তাতে দৃঢ়তার সাথে কায়েম থাকতেন। তিনি অনাবশ্যক নমনীয়তা বা দৃঢ়তা পরিহার করতেন। আর বিচারের পাল্লা সব সময় কায়েম রাখতেন। এরূপে তাঁর সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় যে, "তিনি কাযী হবেন"।)

মিঁয়া শরীফ আহমদ সাহেবের জীবনে কাঠিন্য ও প্রাচুর্য বিভিন্ন সময়ে বার বার এসেছে। সব সময় তিনি রাজকীয় মেজায বজায় রাখেন। তিনি মনের দরবেশ আর চালচলনে বাদশাহ্ ছিলেন। প্রাচুর্যের সময়ের কথা কি বলব, কাঠিন্যের সময়েও তিনি তার রাজকীয় মেজায কায়েম রাখেন। অনেক সময় তো এরূপ হয়েছে, তিনি

পথে চলার সময় কোন গরীবকে পাশ থেকে হেঁটে যেতে দেখে হঠাৎ পকেট থেকে একশ' টাকার নোট বার করে তার হাতে রেখে দিতেন। গরীব লোকটি আশ্চর্য হয়ে নিজের চোখ রগড়াতো আর এ দরবেশ বাদশাহ নিঃশব্দে ওখান থেকে চলে যেতেন। নিজের খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকাতে অনেক সময় তিনি ঋণী হয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁর রাজকীয় খরচের মাত্রার কোন পরিবর্তন হ'ত না। সারা জীবন তিনি রাজকীয় চালচলন বজায় রাখেন। সম্ভবত সন্তান প্রাপ্তির সময়ে খোদার ফিরিশ্‌তারা আসমানে তার পরবর্তী জীবনের ঘটনা দেখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কানে এ শব্দ পৌছান "ঐ বাদশাহ্ আসছে।"

প্রকৃতপক্ষে এ চার ইলহাম যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে প্রিয় মির্যা শরীফ আহমদের নিজস্ব জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য নাযেল হয়েছে। কিন্তু এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, পরবর্তী বংশধরের মাঝে এ ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু কিছু বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পেতে পারে। খোদাতাআলার সুন্নত এই যে, কখন কখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খোদার কোন কথা প্রকাশ হয়ে যায়। অনেক সময় সে ব্যক্তি ব্যতীত তার সন্তান-সন্তানাদির বা তার বংশধরদের মাঝে পূর্ণ হয়। যেমন আমাদের প্রভু আঁ হযরত (সঃ) রোমান সম্রাটের মূল্যবান কঙ্কণ নিজের হাতে পরা অবস্থায় দেখেন। কিন্তু এ কঙ্কণ পাওয়ার আগেই তাঁর (সঃ) মৃত্যু হয়। আরও কঙ্কণ তাঁর খলীফা আর আধ্যাত্মিক পুত্রদের হাতে আসে। অথবা যেমন আঁ হযরত (সঃ) দেখেন মক্কা বিজয় হয়েছে। আর হুযূর (সঃ) এর ব্যবস্থাপনা আসীরের ওপর অর্পণ করেন। কিন্তু আসীর তাঁর জীবনকালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি (সঃ) মক্কা বিজয়ের পর তাঁর পুত্র আতায়াব বিন আসীরকে মক্কার হাকীম করেন। এসব মেহেরবানী খোদার কুদরতের বিরল বস্তু, যদ্বারা আধ্যাত্মিক দুনিয়া পরিপূর্ণ দেখা যাচ্ছে। খোদাতাআলা তাঁর কল্যাণকর কাজ সব থেকে ভাল বোঝেন।

(মাসিক আনসারুল্লাহ্‌র মার্চ, ২০০০ সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ ঃ কওসার আলী মোল্লা

নতুনদের পাতা

সেহরী ও ইফতার

পবিত্র রমযান মাসে খোদাতাআলা আমাদের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে নেকীর রাস্তা খুলে রেখেছেন। আমরা এমনও আছি যারা এত এত নেকীর কথা জেনেও সামনের দিকে অগ্রসর হতে চাই না। খোদাতাআলা এ রমযান মাসের পুরস্কার নিজে দান করেন, যার তুলনা অন্য কোন নেকীর সাথে জড়িত করেন নি। রযমানের রোযা রাখাই শুধু নেকীর কাজ নয়। ঠিক মত সেহরী খাওয়ারও আনন্দ, নেকী ও ফযিলত রয়েছে।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "তোমরা সেহরী খাও। কারণ সেহরীর মাঝে রয়েছে বরকত" (বুখারী, মুসলিম)।

আরেকটি হাদীস ঃ আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল করীম (সঃ) বলেন ঃ "আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবের রোযার মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সেহরী খাওয়া" (মুসলিম)।

রোযা রাখার প্রচলন সকল জাতির মাঝেই রয়েছে, কিন্তু অন্যসব জাতির রোযা রাখা আর মুসলমানদের রোযা রাখার মাঝে অনেক পার্থক্য। অন্যরা রোযা রাখে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে আর মুসলমান জাতি রোযার মাধ্যমে আত্মাকে সুস্থ ও তাজা রাখে কারণ অন্যরা শুধু না খেয়ে পড়ে থাকে। আর শ্রেষ্ঠ উম্মত আল্লাহ্‌র এক মাত্র মনোনীত ধর্ম যার নাম ইসলাম এর অনুসারীরা বাহ্যিক খাবার ত্যাগ করে অধ্যাত্মিক খাবার খায় যেমন বেশি বেশি নামায, সেহরী খাওয়া, ইফতার করা এসব কেবল আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই করি যার ফলে আমাদের আত্মা হয়ে উঠে। যেভাবে রসূল করীম (সঃ) বলেন, "অন্যদের রোযার মাঝে সেহরী নেই কিন্তু আমাদের মাঝে সেহরী আছে"। সেহরী খাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করে ঘুম থেকে উঠতে হয় আর এ কষ্ট কেবল আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্টি করার জন্য। অন্যান্য জাতি এ কষ্টটুকু করে না। কাউকে খুশিও করার শক্তি থাকে না তাদের। যার ফলে তারা পরকালে খোদার আশিস হতে বঞ্চিত। শুধু পরকালেই নয় এ কালেও তারা বঞ্চিত।

আমরা যে সেহরী খাব তা কখন খাব? আসুন এ ব্যাপারে রসূল করীম (সঃ) কী বলেছেন তা দেখি। যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে সেহরী খেলাম, তারপর নামাযে দাঁড়ালাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সেহরী ও নামাযের মাঝে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? জবাব দিলেন পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মতো সময়ের ব্যবধান ছিলো" (বুখারী, মুসলিম)।

রসূল করীম (সঃ)-এর এ কথা হতে আমরা বুঝাতে পারি যে, সেহরী খেয়েই যে নামায পড়বো তা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ সময় এর মাঝে ব্যবধান থাকতে হবে। যেমন, আযানের পর নামায কমপক্ষে আরও ১৫/২০ মিনিট দেরীতে হয়, এই দেরীটুকুই যথেষ্ট। অর্থাৎ এ হাদীস মতে সেহরী আযানের পূর্ব সময় পর্যন্ত খাওয়া যাবে। কারণ আযানের পর নামাযের জন্য আমরা বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই থাকি। এভাবে সেহরী শেষ করা উচিত নয় যে, খেয়েই কোন মতে নামায ধরবো। এমনভাবে শেষ করতে হবে যাতে মসজিদে বসে কিছুক্ষণ যিক্‌রে ইলাহীতে রত থাকা যায় বা কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করা যায়। আমরা দেখি প্রায় পরিবারেই দু'একজন ছোট ছেলে-মেয়ে রয়েছে। যারা সবসময় চায় রোযা রাখতে এবং সেহরী খেতে। তাদেরকে সেহরী খাওয়ানোর ব্যাপারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) গত ৩০-৫-১৯৮৬ তারিখের জুমুআর খুতবায় বলেন, "রমযান মাসে দ্বিতীয় কথা এই যে, ছোটদেরকে সেহরী খাওয়ার সময়ে উঠিয়ে খাওয়ার পূর্বে নফল নামায পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করা হোক। কাদিয়ানে এ রীতিই ছিলো। এটা খুবই আবশ্যকীয় ও কল্যাণপদ। এখন একে অনেক ঘরেই পরিত্যাগ করা হয়েছে। কাদিয়ানে এ কথা প্রচলিত ছিল যে, রোযা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ছোটদেরকে ঠিক সেই সময়ে উঠানো হতো না যে, কেবল খাওয়ার কাজ সমাধা করা যায় বরং অবশ্যই এতটা আগে ভাগে উঠানো হতো যেন তারা কমপক্ষে ৪ রাকাত নফল নামায পড়ে নিতে পারে। সুতরাং মায়েরা ছোটদের ততক্ষণ পর্যন্ত খাবার দিতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নফল নামায পড়ে আসতো। সর্বপ্রথম উঠিয়ে ওযূ করিয়ে দিতেন এবং পরে তাদেরকে নফল নামায পড়াতেন যেন তারা অবহিত হতে পারে যে, রোযার আসল উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিকতা লাভ

করা। এ বিষয়ের প্রতি চেষ্টা থাকতো যে, ছোটরা প্রথমে তাহাজ্জদ পড়ে নিক। কুরআন করীমের তেলাওয়াত করার পরে খাবার খেতে আসুক। আর অধিকাংশ সময়ে ইল্লা মাশাআল্লাহ্ তাহাজ্জদের সময় খাবারের সময় থেকে অধিক হতো।"

তাই আমাদেরও উচিত সেহরীর সময়ে ছোটদেরকে শুধু খাবার প্রতিই আকৃষ্ট না করে নফল নামাযের প্রতিও যেন আকৃষ্ট করি। এতে তারা বুঝবে যে,রমযান মাসে শুধু রাতে উঠে খেলেই হয় না নামাযও পড়তে হয়। আল্লাহ্‌র আশীষের জন্য আমাদের উচিত সেহরী সঠিক সময়ে খেয়ে সেহরীর যে বরকত ও ফযিলত খোদাতাআলা রেখেছেন ও আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন এর অনুসরণ করা। খোদাতাআলা আমাদেরকে সেই তৌফীক দান করুন, আমীন।

সকল ধর্মীয় গোত্রের মাঝেই রোযার ব্যবস্থা রয়েছে তবে ইসলামে যে রোযার ব্যবস্থা তা আর অন্য কোন জাতির মাঝে নেই যেমন, নামায, সেহরী-ইফতার বেশি বেশি দান করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ্‌তাআলা এ মাসের প্রতিটি নেক কাজের উত্তম বিনিময় তিনি দান করেন। এ মাসের নেকীর জন্য খোদাতাআলা এক একটির জন্য আলাদা আলাদা ফযিলত রেখে দিয়েছেন; আজ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হলো যথা সময়ে ইফতার করার যে ফযিলত কতটুকু তা নিয়ে। আমরা তো সবাই রোযা রাখি এবং ইফতারও করি কিন্তু অনেকেই বুঝি না, অবিলম্বে ইফতার করায় যে কত নেকী রয়েছে। আমরা মনে করি যত দেরী করে ইফতার করবো ততই রোযা পাকাপোক্ত হবে। তাহলে চলুন হাদীস খুলে দেখি রসূল করীম (সঃ) এ ব্যাপারে আমাদের কী নসীহত করে গেছেন ঃ

সাহ্‌ল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ লোকেরা যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে ততদিন কল্যাণের মাঝে অবস্থান করবে" (বুখারী, মুসলিম)।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলছেন ঃ মহান প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন, "আমার বান্দাদের মাঝে যারা অবিলম্বে ইফতার করে তারাই আমার কাছে অধিক প্রিয়" (তিরমিযী)।

আবূ আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। মাসরূক তাঁকে বললেন, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দু'জন সাহাবী সৎকাজ করার ব্যাপারে কোন প্রকার গড়িমসি করেন না। তাদের একজন অবিলম্বে মাগরিবের নামায পড়েন এবং অবিলম্বে ইফতার করেন আর অন্যজন বিলম্বে মাগরিব পড়েন এবং বিলম্বে ইফতার করেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, কে অবিলম্বে মাগরিব পড়েন এবং ইফতার করেন? মাসরূক জবাব দিলেন, আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। আয়েশা (রাঃ) বললেন, রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এমনটিই করতেন" (মুসলিম)।

আঁ হযরত (সঃ)-এর এ কথা পাঠ করে আমরা বুঝতে পারছি যে, তিনি (সঃ) এবং মহান আল্লাহ্‌তাআলা যা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন তাহলো ইফতার অবিলম্বে করা অনেক বরকত ও নেকীর কাজ। যেমনভাবে আল্লাহ্ বলেন, "আমার বান্দাদের মাঝে যারা অবিলম্বে ইফতার করে তারাই আমার কাছে অধিক প্রিয়।" এ কথাটিকে আমাদের খুব ভাল করে চিন্তা করা উচিত। আল্লাহ্‌র প্রিয় তারাই যারা অবিলম্বে ইফতার করে, তাই বলে আমরা কেন রোযা পাকা করার জন্য বসে থাকবো? আমাদের উচিত সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা।

রসূল করীম (সঃ) বলেন, "যখন রাত সেই (পূর্ব) দিক থেকে আসে, দিন সেই (পশ্চিম) দিকে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায় তখনই রোযাদার ইফতার করবে" (বুখারী ও মুসলিম)।

আরেক স্থানে উল্লেখ আছে, আবূ ইব্রাহীম আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি ছিলেন রোযাদার। যখন সূর্য ডুবে গেলো, তিনি দলের এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ হে অমুক! (সওয়ারী থেকে নেমে) আমাদের জন্য ছাতু গুলে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সাঁঝ হতে দিন। তিনি বলেন ঃ নেমে দাও, আমাদের জন্য ছাতু বানাও। লোকটি বলল, এখনো তো দিন বাকি আছে? তিনি (আবার) বলেন ঃ নেমে যাও, আমাদের জন্য ছাতু বানাও। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা (রাঃ) বলেন, সে ব্যক্তি নেমে গেলো এবং ছাতুগুলো তাঁর সামনে আনলো। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তা পান করলেন, অতঃপর হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেন ঃ যখন রাতকে ওদিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

আশা করি ইফতারের ফযিলত নিয়ে আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন নেই। রসূল করীম (সঃ) কি দিয়ে ইফতার করতেন তা নিয়ে কিছু আলোচনা করলে মনে হয় ভালই হয়, তা হলে হাদীস খুলে দেখতে হয়।

সালমান ইবনে আখের আদ্ দাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে তখন তার খুরমা খেজুর দিয়ে ইফতার করা উচিত। তবে যদি সে খুরমা খেজুর না পায় তাহলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে কারণ পানি হচ্ছে পাক-পবিত্র" (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নামাযের পূর্বে ইফতার করতেন কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে। যদি তিনি তাজা খেজুর না পেতেন তাহলে শুকনো খেজুর (অর্থাৎ খুরমা) দিয়ে। আর যদি তা-ও না পেতেন তাহলে কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন" (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)।

এখন চিন্তা করে দেখুন রসূল করীম (সঃ) কত সাধারণভাবে ইফতার করতেন আর আজ আমরা কত ধরনের খাদ্য দিয়ে ইফতার করছি। এক ভাই যেন কত খেয়ে যাচ্ছি আরেক ভাই-এর যে কিছুই নেই খাওয়ার মত তা-ও লক্ষ্য করছি না এটা কি ঠিক হচ্ছে আমাদের? এ রোযা কি খোদাতাআলা গ্রহণ করবেন? ইফতারে অপচয় না করে প্রতিবেশীদের সাথে নিয়ে ইফতারের কাজ আমাদের শেষ করা উচিত। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক সময় ইফতার করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

- মাহমুদ আহমদ সুমন
মোয়াল্লেম

রূহ-মিযান

বয়াত কী? এর প্রয়োজনীয়তা-ই বা কি? ইত্যাকার নানান প্রশ্ন আমাদের অন্তরাত্মাকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। সোজা কথায়, বয়াত মানে হচ্ছে বিক্রি করে দেয়া। কোন একজন আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তির (যিনি আল্লাহ্ কর্তৃক বয়াত গ্রহণের জন্য আদিষ্ট) হাতেই কেবল বয়াত গ্রহণ করা যায়। পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতাহ্'র ১১ নং আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন, "নিশ্চয় যারা তোমার বয়াত করে বস্তুতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র বয়াত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর আছে। অতএব যে ব্যক্তি (বয়াতের) অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে সে নিজেরই বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং সে ব্যক্তি সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যা সে আল্লাহ্‌র সাথে করেছে, তাকে তিনি অচিরেই মহা পুরস্কার দান করবেন।"

এ আয়াতে আল্লাহ্‌পাক তাঁর বান্দাদেরকে বলছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাতে বয়াত করে সে যেন খোদাতাআলারই হাতে বয়াত করলো। আর যারা বয়াত গ্রহণ করে তাদেরকে খোদাতাআলা মহাপুরস্কারে ভূষিত করে থাকেন। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির প্রতিও এ রীতি আরোপিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং রসূলের নামে বয়াত নেয় আর সে ব্যক্তির সাথে যদি কুরআন ও হাদীসের দলিল থাকে তবে সেই ব্যক্তির হাতে হাত রেখে সর্বান্তঃকরণে ঈমানকে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত করার অঙ্গীকারের নামই বয়াত। আর যে ব্যক্তি বা ইমামের হাতে হাত রাখা হবে খোদাতাআলারই হাতের উপর হাত রাখার শামিল। বয়াত গ্রহণের কিছু বাহ্যিক ফলাফলও আছে। যেমন এক নেতার অধীনে থাকার ফলে বৈশ্বিক একত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সারা পৃথিবীতে সে যেখানেই থাকুক না কেন এক ইমামের হাতে বয়াত নেয়া হাতগুলো (মনগুলো) অন্য হাতগুলোর স্পর্শানুভব করবে তাদের হৃদয়ে-মননে অনুভবে। এক দেশের মানুষ কোন বৈরী পরিবেশে পতিত হলে অন্য দেশের লোকও সমানভাবে ব্যথিত হবে। যাদের মাথা এক তারা তো বিভিন্ন হলেও একই দেহ। পায়ে বা হাতে যেখানেই আঘাত লাগুক না কেন সবাই এক সাথে কাঁদবে। আবার আনন্দের সংবাদেও সবাই এক সাথে হাসবে। এক নেতার অধীনে থাকলেই কেবল প্রকৃতার্থে উম্মতে ওয়াহেদা গঠন সম্ভব। আল্লাহ্‌তাআলার তৌহীদ বা একত্ববাদের এটাও একটা প্রমাণ যে, সব মুসলমান এক থাকবে। যাদের মাঝে নেতা নেই তাদের অবস্থা সেই মেষপালের মত যার কোন রাখাল নেই। প্রকৃতার্থে বয়াত করার ফলশ্রুতিতে পূর্বাপর সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। সে বয়াত গ্রহণ যদি সঠিক অন্তঃকরণে হয়। কেননা বয়াতের মাঝে তওবার বিষয়ও সন্নিবেশিত থাকে। তাই এটা একটা বিরাট সুযোগ যে, যুগ ইমামের হাতে বয়াত হয়ে নতুন শিশুর মত পবিত্র হওয়া। তবে শর্ত থাকবে পাপ পরিহার করার মানসে বয়াত গ্রহণ করতে হবে। বয়াত গ্রহণের ফলে আধ্যাত্মিক অভিভাবক পাওয়া যায় অনেক সময় (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই) জাগতিক উন্নতিরও কারণ হয়ে থাকে। তবে কেউ যেন মনে না করেন যে, আহমদীরা বয়াত করে জাগতিক ফায়দা লুটছেন। এখানে জাগতিক সুবিধা বলতে বোঝানো হচ্ছে, জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত আহমদীরা খলীফার কাছ থেকে নিয়ে থাকে। অনেকে শুনে আশ্চর্য হয় যে, সন্তানদের নাম পর্যন্ত জামাতে আহমদীয়ার মহান খলীফা রেখে দেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন-

"হে নবী! যখন মু'মিন মহিলাগণ তোমার কাছে বয়াত করার জন্য আসে এ শর্তে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং চুরি করবে না এবং ব্যভিচার করবে না এবং নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, এবং কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করবে না, যা তারা নিজেদের হাত ও পায়ের মাধ্যমে মিথ্যা রচনা করে থাকে এবং কোন সংগত বিষয়ে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তা হলে তুমি তাদের বয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী (৬০ঃ১৩)।

এখানে মু'মিন নারীদের ঈমান আনয়ন বা বয়াত করার জন্য যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে তা একইভাবে পুরুষদের বেলায়ও প্রযোজ্য। এ সূরাতে মহিলাদের মক্কা হতে মদীনায় আসার পর তাদেরকে যাচাই-বাছাই করে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত শর্তের উপর যেন বয়াত নেয়া হয় এ কথাই নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, যা পূর্ব হতে চালু হয়ে আসছিল। এ আয়াতে বয়াত গ্রহণ করার জন্য আবশ্যক কী কী অঙ্গীকার তা ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কুরআনে বলেন- "আমি কিনে নিলাম মু'মিনের প্রাণ ও ধন-সম্পদ বেহেশ্‌তের বিনিময়ে"। যদি আমরা জান্নাতের প্রত্যাশী হই তাহলে আমাদেরকে সঠিক অন্তঃকরণে বয়াত গ্রহণ করে তওবা করতে হবে। হযরত জরিদ বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন- "আমি নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানের মঙ্গল কামনা করণ, এ অঙ্গীকার নিয়ে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাতে বয়াত হয়েছি।" একটু আগে যে আয়াতটি বর্ণনা করা হয়েছে তা যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য-এর সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। "ইবনে শিহাব বলেছেন, আবু ইদ্রিস খওলানী বলেছেন, তিনি ওবাদা বিন সাবেতকে বলতে শুনেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার এক মাহ্‌ফিলে বক্তৃতায় আমাদিগকে বলেছিলেন, 'তোমরা আমার হাতে এ মর্মে বয়াত হবে যে, তোমরা কাউকে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার বানাবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবে না, কারো বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করবে না, পুণ্যকর্মে আসায় অবাধ্য হবে না। সুতরাং যারা এ শর্তসমূহ পালন করবে তাদের জন্য পুরস্কার অবধারিত। যে ব্যক্তি কোন পাপকর্ম করবে এবং ইহকালে তার শাস্তিও পেয়ে যাবে তার জন্যে এ শাস্তিই যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে। (বুখারী, কিতাবুল আহকাম)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন,

"নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা একটি বৃক্ষতলে তোমার বয়াত করছিল এবং তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি তাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন" (৪৮ঃ১৯)।

বয়াত বা দীক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন না হলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। বয়াত কী ধরনের হবে বা কোন্ কোন্ বিষয়াবলী এতে সন্নিবেশিত হবে তা হাদীসে নববীতে বিস্তারিতভাবে এসেছে। মূল কথা হচ্ছে, আমল যতই উন্নত হোক না কেন পৃথিবীর বুকে প্রেরিত খোদাতাআলার প্রতিনিধিকে এজন্য জানতে হবে এবং তাঁর হাতে বয়াত করতে হবে যেন মান্যকারী বাকী সব মুসলমান বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকে। তাদেরকে একত্রীকরণ ও পবিত্রকরণই বয়াতের উদ্দেশ্য। বয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় মানুষ খোদা প্রেরিত রসূল বা তাঁর প্রতিনিধিকে মানলো কি না? (!) এ পথকে এজন্য দুর্গম করা হয়েছে যেন, সত্যিকার মু'মিনদেরকে আলাদা করা যায়। তবে যাঁর হাতে বয়াত হতে হবে তাকে অবশ্যই এ দাবী করতে হবে, "খোদা জানিয়েছেন যে, আমি খোদার পক্ষ হতে।" আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেছেন-

"এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হয়ো না" (৩ঃ১০৪)।

আয়াতটিতে "সমবেতভাবে" আল্লাহ্‌র রজ্জু-কে ধরার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এমন এক পবিত্রকরণ শক্তি দরকার যার নামে সবাই একত্র হবে। বর্তমানে একমাত্র জামাতে আহমদীয়ার কাছেই সেই খিলাফত আছে যা সমস্ত বিশ্বকে ক্রমেই একসূত্রে গ্রথিত করে চলছে। এক খলীফার অঙ্গুলি হেলনে সারাবিশ্বের প্রায় ২০ কোটি আহমদী মুসলমান এক সাথে উঠে বসে। একে বলে সমবেতভাবে "আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধরা এবং বিচ্ছিন্ন না হওয়া"। সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এ রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মাঝে আদেশ দেয়ার অধিকারী।"

এ সর্বজনমান্য আদেশ দানের অধিকারী বা উলীল-আমর একমাত্র জামাতে আহমদীয়ারই আছে। একইভাবে বয়াতের গুণে আহমদী জামাতের প্রতিটি স্তরের আহমদীগণ প্রতিটি স্তরের কর্মকর্তার আদেশ মান্য করে থাকেন। তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিধিবিধানের মুখবন্ধে ওকীলে আলা চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব বলেন- "মৌলিক বিষয় হলো প্রেরণা। আহমদী কর্মীগণ শৈশব থেকেই সে সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ পেয়ে আসে। যখন তারা সে প্রশিক্ষণে পরিপক্কতা ও বুৎপত্তি অর্জন করে তখন আসলে তারা কোন বিধি-বিধান পাঠ করে না। এক মাত্র যে নীতিটি তারা জানে তাহলো প্রথমত আমীরের ইতায়াত বা আনুগত্য। আমীরকে সম্মান করা এবং তাদের সম্মানজনক দ্বি-মতের অধিকারী এবং তাদের দ্বি-মত কেবল আমীরকেই জানাবে অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাদের নিজেদের মাঝে কোন প্রকার বিষবাষ্প না ছড়িয়েই।"

সহীহ্ বুখারী শরীফের হাদীস। হযরত ওবাদা বিন সাবেত (রাঃ) বলেছেন- আমরা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর হাতে এ বলে বয়াত হয়েছিলাম (অঙ্গীকারাবদ্ধ বা বিক্রি-প্রবন্ধকার) যে, "আমরা শুনব, আমরা আনুগত্য করব, আদেশ আমাদের মনঃপূত হোক বা না হোক।"

একেই বলে বয়াত। একেই বলে বিক্রি হয়ে যাওয়া। নিজের আমিত্বকে বিলিয়ে দিতে পারলেই কেবল খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নফস্‌কে দমন করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ বয়াতের কোনই মূল্য নেই। বয়াত হচ্ছে সেই অবস্থার নাম যেখানে পৌঁছে মানুষ বলতে পারে, "আমার সব প্রার্থনা, নামায, রোযা, জীবন-মরণ সব কিছু বিশ্বের একমাত্র প্রভু আল্লাহ্‌র পবিত্র নামে নিবেদিত।"

বয়াত করা আর মৃত্যুবরণ করা একই কথা। যখন কোন ব্যক্তি যুগ-ইমামের হাতে বয়াত গ্রহণ করে তখন সর্বাবস্থায় সেই নেতার প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখবে-এ অঙ্গীকারের মধ্য দিয়েই বয়াত করে থাকে। যেমন কিনা বুখারী শরীফে হযরত হাতেম এযিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "আমি সালমার কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি হুদায়বিয়ার স্থানে কোন্ কথার উপর আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাতে বয়াত হয়েছিল। তিনি উত্তরে বললেন, "মৃত্যু"র শর্তে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের উল্লেখিত বয়াত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) নিতে পারেন কিনা (?)। তিনি (আঃ) বলেন, "আমরা আমাদের বিজ্ঞাপনেও এ ইলহাম লিখেছি, "নিশ্চয় যারা তোমার হাতে বয়াত হয় তারা আল্লাহ্‌র হাতে বয়াত হয়"। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেন, "প্রকৃত সত্য এটাই যে, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র কল্যাণরাজির ধারাবাহিকতাকে কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখার উদ্দেশ্যে এ যুগে পুনরায় বয়াতের প্রচলন করা হয়েছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে। বাহ্যত আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত হই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাতে বয়াত হওয়ায় সৌভাগ্য লাভ করি। কারণ, ইলহামের বাক্য এই যে, 'যারা তোমার হাতে বয়াত হয় তারা আল্লাহ্‌র হাতে বয়াত হয়।' আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যেভাবে মহানবীর হাত আল্লাহ্‌র হাত একইভাবে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর হাতও হযরত মহানবীরই হাত। আর ইমাম মাহ্‌দীর অবর্তমানে তাঁর খলীফার হাতই সেই হাত যাতে বয়াত করার তাগিদ কুরআন ও হাদীসে বিবৃত হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন- "চারিদিকে হিংস্র জীব-জন্তু কিন্তু আমি একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।" বয়াতের অঙ্গীকার পূরণকারীদের মাঝে অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছিলেন হযরত সাহেবযাদা মৌলবী আব্দুল লতীফ শহীদ সাহেব। তাঁর সম্পর্কে হযরত মসীহ্ (আঃ) বলেন-

"দেখ! মৌলভী আব্দুল লতীফ শহীদ সাহেব আমার হাতে বয়াত হয়েছিলেন ফলে, প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়ে মারা গেলেন। এক ঘন্টা পর্যন্ত একটানা তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। এমনকি তাঁর শরীর পাথরের নীচে সমাহিত হয়ে গেলো। কিন্তু তিনি উহ্ পর্যন্ত মুখ থেকে বের করেন নি। একটি বারও একটা চিৎকারও দেন নি। বরং এমন পাথর নিক্ষেপের চরম অত্যাচার আরম্ভ করার পূর্বে স্বয়ং আমীর তিনবার তাঁকে অনুরোধ করে হযরত শহীদকে তওবার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন যেন তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারেন এবং পূর্বের তুলনায় অধিক সম্মান ও পদমর্যাদা দানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু হযরত শহীদ একমাত্র আল্লাহ্‌কেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে কি ঘটতে যাচ্ছে তা তিনি গ্রাহ্য করেন নি। ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঈমানের পূর্ণতার একটি অপূর্ব, উত্তম ও জীবন্ত নমুনা রেখে গেলেন। তিনি বড় বুযুর্গ আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। আমরা শুনেছি, যখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল হত্যার ময়দানে, তখন তাঁকে বলা হয়েছিল, "তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের সাথে একবার শেষ বারের মত দেখা কর।" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'এর কোন প্রয়োজন নেই। দেখা হলে তাদের প্রতি আমার মনে দুর্বলতা সৃষ্টি হ'তে পারে। সব শেষ হয়ে গেছে। আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।" রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে বয়াত নেয় কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ না তাদের সাথে কথা বলবেন না তাদেরকে পবিত্র করবেন বরং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব অবধারিত করা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর কিশ্‌তিয়ে নূহ পুস্তকে বলেন- "জেনে রাখা উচিত যে, কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারে কোনই মূল্য নেই। যে পর্যন্ত দৃঢ় চিত্ততার সাথে এর উপর আমল করা না হয়। অতএব যে ব্যক্তি আমার শিক্ষানুযায়ী পূর্ণভাবে কাজ করে, সে আমার সেই গৃহে প্রবিষ্ট হয়ে যায় যার সম্বন্ধে খোদাতাআলার বাণীতে এ ওয়াদা রয়েছে যে, "তোমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যারা বাস করে, আমি তাদের প্রত্যেককেই রক্ষা করব।"

খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেন-

"তোমাদেরকেও খোদাতাআলা স্বীয় ফযলে আমাদের বাদশাহ্ মসীহ্ (আঃ)-এর মাধমে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরে একত্র করেছেন। এরপর তাঁর (আঃ) মৃত্যুর পর আমার হাতে তোমাদেরকে বিভক্তি থেকে বাঁচিয়েছেন। এ নেয়ামতের কদর কর, আর অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে জড়িয়ো না।"

আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হ'তে হ'লে প্রত্যেককে দশটি শর্তের উপর আমল করার অঙ্গীকার করতে হয়। অনেকে আহমদীয়তের সত্যতাকে বুঝার পরও বলে থাকেন যে, আমি ঐ শর্তগুলো মানতে পারবো না। তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন, বয়াত করা মানে স্কুলে ভর্তি হওয়া। আর সিলেবাস হচ্ছে ঐ দশটা সোনালী শর্ত! যা পালন করলে জীবন ও আখেরাত সুন্দর ও সফল হবে। তাই ভর্তির প্রথম দিনেই সব শিখে ফেলবে মনে করা যেমন বোকামি ঠিক তেমনি বয়াত গ্রহণের সাথে সাথেই যে একজন মানুষ সব শর্ত (বিনাশর্তে!) মেনে নিবেন অর্থাৎ পালনও করবেন তা ভাবাটা নিতান্ত নির্বোধের কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আমরা যারা পুরনো আহমদী আছি তাদের নিজেদের আমল দিয়ে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক যাতে নবাগতরা ঈমানের সুরভি পায়। হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন- যদি কারো কোন আমল দেখে কেউ পথভ্রষ্ট হয় তবে কতই না ভাল হতো যদি সেই ব্যক্তি জন্মই না নিত। খোদায় বিলীন হওয়ার মাধ্যমে আমাদের জন্ম স্বার্থক হোক। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের গোলামীর মাধ্যমে এ জীবন ধন্য হোক, আমীন।

- মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব (জয়)

ওয়াক্‌ফে নও ও তাদের পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে দু'টি কথা

প্রথমেই আমি সূরা সাফ্‌ফ-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত দিয়ে আরম্ভ করছি, পাক কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন।

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমারা কেন তা বল যা কর না অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা তা বল যা কর না।" ছোট বেলা হতে শপথ বাক্য পাঠ করে আস্‌ছি- আমি আমার জীবন, সম্পদ, সময়, মান-সম্মান কুরবানী করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবো এবং খলীফায়ে-ওয়াক্ত যে উত্তম ফয়সালা দিবেন তা পালন করাকে অত্যাবশ্যক জ্ঞান করবো। ১৯৮৯ সনের ১০ ফেব্রুয়ারীর জুমুআর খুতবায় হুযূর বলেন, কুরআন পড়া অত্যন্ত প্রয়োজন। যেসব ঘরে ওয়াকফে নওয়ের জীবন উৎসর্গকারীরা রয়েছে, সেখানে তেলাওয়াতের উপরে অনেক জোড় দেয়া উচিত। যদিও অল্প অল্প পড়ান হয়, তা তরজমার সাথে মর্মার্থ বর্ণনা করার মাধ্যমে পড়ানো হোক এবং শিশুদের অভ্যাস করান হোক যেন তারা যা কিছু তেলাওয়াত করবে তা বুঝে শুনে করবে। প্রথমে সাধারণ জাগতিক জ্ঞানের ভিত্তি ব্যাপক হোক তারপর ধর্মীয় জ্ঞান যোগ হোক তা হলে একটি অতি সুন্দর বরকতমন্ডিত পবিত্র বৃক্ষ সৃষ্টি হতে পারে। উর্দূ শিক্ষা বেশি প্রয়োজন কারণ মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর লিখিত কিতাব সবই উর্দূতে। তাই উর্দূ শিক্ষা করা উচিত। সাথে ইংরেজী, বাংলা ও আরবী অবশ্যই থাকবে।

ওয়াকফে নও অত্যন্ত দামী সন্তান। কেননা তাদের কাঁধে ভবিষ্যৎ কালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হবে। তাদের তা'লীম-তরবিয়ত (শিক্ষা-দীক্ষা) এর দায়িত্ব নেযামে জামাত এবং পিতামাতা উভয়ের উপর ন্যস্ত হয়। ওয়াকফে নওদের প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় হ'ল শিশুদেরকে প্রথম থেকেই তাদের মস্তিষ্কে গেঁথে দেয়া উচিত যে, তারা ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গীত। বড় হয়ে কোন না কোনভাবে নিজেদের যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে সারাজীবন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাদেরকে কাজ করতে হবে।

হুযূর (রাহেঃ) বলেছেন, তাদেরকে শৈশব হতে এ কথা সম্মত করানো আরম্ভ করা হোক যে, তুমি এক মহান উদ্দেশ্যে এবং মহান সময়ে জন্মগ্রহণ করেছ। ইসলামের এক বিজয় শতাব্দীর বিজয়ের অপর এক শতাব্দীর সাথে সংযোগকালে তোমাদের জন্ম। পিতামাতার উচিত সন্তানদের বুঝিয়ে দেয়া যে, তারা ইসলামের জন্য ওয়াক্‌ফ বা উৎসর্গীকৃত। সন্তানদের চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে হলে গৃহে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা শিশুকাল হতেই খোদা সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এ জন্য বাড়ীতে সন্তানদের নিয়ে বা-জামাত নামায আদায় করতে হবে। ঘরে ইসলামী রীতি-নীতি চালু করতে হবে। সালামের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রতিদিন ফজরের কুরআন পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে গৃহে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হলে তারা খোদা-ভীরুতে পরিণত হবে এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকবে। সূরা আন্ নযমের ২৫নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-মানুষ যা চায় তা কি পায়- এ জন্যই হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) আমাদের প্রচেষ্টার সাথে দোয়া জারি রাখতে বলেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, মানুষ যদি সফলকাম হতে চায় তা হলে তার কর্তব্য বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়া করা কিন্তু দোয়ার সাথে তার সংকল্প এবং স্পৃহা সংযুক্ত হওয়া উচিত। তবেই দোয়া ফলদায়ক হবে। এ কথাগুলো ১৯৪৩ইং সনের ২২শে অক্টোবরের জুমুআর খুতবায় দেয়া হয়েছিল। হাদীস শরীফে এসেছে, সন্তানদের উদ্দেশ্যে পিতার দোয়া কবুল হয়, তাই সব সময় আমাদের দোয়া জারি রাখা উচিত। আল্লাহ্‌তাআলা সন্তানদের জন্য আমাদেরকে দোয়াও শিখিয়েছেন [রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজেনা ওয়াযুররিআতিনা কুররাতাআইওনিন ওয়াজাআলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা] অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।

প্রত্যেক আহমদী শিশুর মনে এ কথা বদ্ধমূল হওয়া প্রয়োজন যে, আমার একজন খোদা আছেন। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি আমার হাকিম ও মালিক এবং নামায ও দোয়ার মাধ্যমে তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। ফিরিশ্‌তাগণকে বিশ্বাস করতে হবে যারা পুণ্য কাজের জন্য প্রেরণা যোগান এবং খারাপ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখেন।

আহমদী শিশুদের মনে এ কথাও বদ্ধমূল হওয়া দরকার। খোদা দুনিয়ার লোকদের পথ প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন সময়ে ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং এগুলোর মাঝে শেষ গ্রন্থ ও শেষ বিধান হ'ল কুরআন মজীদ। এর উপর আমল ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে না। ফোটা ফোটা পানি যদি কঠিন পাথরের মাঝে স্থায়ী চিহ্ন সৃষ্টি করতে পারে তবে মায়ের প্রতিদিনকার সকাল-সন্ধ্যার পবিত্র আদর্শ এবং উপদেশাবলী শিশুদের হৃদয়ে অটল ঈমানের সৃষ্টি করবে না কেন? এখানে এ কথাই এসে যায়, মাকে পবিত্র ও ধর্মপরায়ণ হতে হবে। শিশুদেরকে খোদার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করা, জামাতের কাজে অংশ গ্রহণ করা খোদা প্রদত্ত রিযিক হতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা, বাল্যকাল হতে নামাযের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং নিজ হাতে কিছু না কিছু চাঁদা হিসাবে আদায় করার অভ্যাস করাতে হবে। প্রত্যেক শিশু যেন নিজেকে খোদায়ী জামাতের সদস্য মনে করে। ধর্মপরায়ণ সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য এবং সন্তানকে তরবিয়ত দেয়ার জন্য সে যোগ্যতা একজন ধর্মপরায়ণা 'মা' রাখেন তা কস্মিনকালেও একজন ধর্মহীনা 'মা' রাখেন না। সন্তানের নেক তরবিয়ত সম্বন্ধে ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে, মুসলমান পুণ্যবতী নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে যেন আবদ্ধ হয়। তাদের পুণ্য প্রভাবে সন্তানও পুন্যবান হবে। নবীজী এরশাদ করেছেন, ৪টি বিষয়ের কারণে স্ত্রী নির্বাচন করে থাকে। কতক লোক ধন-দৌলতের উপর ভিত্তি করে স্ত্রী নির্বাচন করে, কতক করে বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে, কতক করে রূপ-লাবণ্য দেখে এবং কতক ধর্মীয় ও চারিত্রিক দিকগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

হে ইসলামের সন্তানগণ। যারা নিজেদের ভাগ্য আল্লার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছ, সর্বদা

চরিত্র ও ধর্মের দিককে প্রাধান্য দিবে। সত্য ইহাই যে, নেক সন্তান পেতে নেক মায়ের চেয়ে বড় কোন যন্ত্র আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ও আকাশের নীচে আবিষ্কৃত হয় নি। যদি নেক সন্তান লাভ করতে চাও তবে সন্তানের জন্মের আগেই সন্তান সৃষ্টিকারী নেক মায়ের সন্ধান কর। পুণ্যবতী মাতাগণ তরবিয়তের বেলায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। আঁ হযরত (সঃ) তাগিদ করেছেন একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার কানে আযানের ধ্বনি পৌছান দরকার। এ আযানের একটি শক্তিশালী স্পন্দন থাকে যার মাঝে সদ্য-প্রসূত শিশুকে ডাকা হয়। হে শ্রবণকারী এদিকে মনযোগ দাও। নামায ও মঙ্গলের রাস্তায় পা ফেলে চলো।

রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র আদেশ থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের তরবিয়ত তার জন্মের সাথে সাথেই হওয়া উচিত। প্রথমে শিশু কিছুই বুঝতে পারে না, এ রকম ধারণা করাও ভুল। কোন না কোনভাবে তার জন্মের সাথে সাথে তার অনুভূতি শক্তির অবশ্যই বিকাশ ঘটে এবং স্মৃতিপটে কিছু জমা থাকে। এতে পিতামাতার শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এখন থেকেই তরবিয়তের চেষ্টা করা উচিত। শিশুদের সামনে খারাপ কথা বলা, খারাপ কাজ করা ও শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা বলা উচিত নয়। এ কথাগুলো তার মস্তিষ্কে বিষস্বরূপ কাজ করে। অনেকের ধারণা ছেলেমেয়ে বড় হলে তরবিয়তের সময় হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ধ্বংসাত্মক এবং ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। সন্তানদেরকে সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রের অধিকারী করার জন্য সৎ পরিবেশে রেখে লেখা-পড়া ও খেলাধূলা করান উচিত। কথায় বলে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। শিশু মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় মাতার গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মত বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছেন, একটি আদর্শ জাতি পেতে হলে একটি আদর্শ মায়ের প্রয়োজন। ছোটবেলা হতেই আর্থিক কুরবানী যেমন জামাতী চাঁদা ও গরীব- মিসকীনকে সাহায্য করার শিক্ষা দিতে হবে। তাদের হাত দিয়ে চাঁদা দেয়ার অভ্যাস করাতে হবে। শিশুদের নিয়ে ঘরে বাজামাত নামায পড়তে হবে। প্রতি জুমুআয় শিশুদেরকে মসজিদে নিয়ে আসার অভ্যাস করতে হবে। ছোট বেলা তার মেধা শক্তি তীক্ষ্ণ থাকে। যা পড়বে তা-ই মনে থাকবে। এ পর্যায়ে মা-বাবার বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। পিতামাতা জামাতের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ছেলেমেয়েদের সামনে গীবত করলে ছেলেমেয়েরা জামাতের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে যায়। তাই পিতামাতা সাবধানতা অবলম্বন করবেন। ঘরে প্রত্যহ নামায পড়ার পর বিশেষ করে ফজরের নামাযের পর কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। ফজরে কুরআন পাঠ আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য। নবী করীম (সঃ) ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ছেলেমেয়েদের সামনে বর্ণনা করবেন। তা হলে ছেলেমেয়েদের মন জামাতের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকবে। ইসলামী রীতি-নীতি ও শিষ্টাচারের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যেমন ঃ সত্য কথা বলা, সালাম আদান-প্রদান করা, ভাল কথা বলা, জামাতী কথা বলা ইত্যাদি।

পিতামাতা যদি সর্বশক্তিমান খোদার দরবারে আকুতি-মিনতি করে দোয়া করেন তা হলে সন্তানদের জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। প্রত্যেক আহমদী পিতামাতাই ছেলেমেয়েদের জন্য দোয়া করেন। এ দোয়ার ফল পরবর্তীতে লাভ করতে থাকে। এটা পরীক্ষিত যে, অনেক ছেলে-মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার হলে বলে, মা-বাবার দোয়ার বরকতে এবার বেঁচে গেলাম। তাই ওয়াকফে নও এবং সাধারণ ছেলেমেয়েদের সাবধান হতে হবে, যেন তাদের দ্বারা মা-বাবার মনে কষ্ট না লাগে। সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহ্‌তাআলা পাক কুরআনে বলেছেন ঃ **আতিউল্লাহ্ ওয়া আতিউর রসূলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম** অর্থ ঃ আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মাঝে যারা অধিকারপ্রাপ্ত (তাদেরও) (সূরা নিসা ঃ ৬০)। যদি মেনে চলতে পার তবে কোন কষ্ট হবে না। দুনিয়াবী ও আখেরাতের জীবন সুখের হবে।

আহমদী জামাতের ছেলে-মেয়েরা যেন যাদের সেই ধরনের আহমদী মুসলমান না হন যা দেখে ইহুদীরা লজ্জা পায়। আল্লাহ্‌তাআলা করুন ওয়াকফে নও ও সাধারণ ছেলেমেয়েরা যেন এ উপদেশ মেনে চলতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে জামাতের কাজ-কর্ম করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

- সৈয়দ আব্দুল হান্নান

স্থানীয় জামাতের প্রতি জরুরী জ্ঞাতব্য

পবিত্র রমযান মাসে স্থানীয় জামাতকে তারাবীর নামায, দরসে কুরআন, জামাতের সদস্য-সদস্যারা বেশি বেশি কুরআন পাঠ, ইফতারী, মালী কুরবানী, বয়াতের ১০টি শর্ত ইত্যাদি বাস্তবায়নে যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়ন করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে জামাতের মুরব্বী, মোয়াল্লেম ও জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশে ফিতরানা মাথা পিছু ৪০/- টাকা এবং যারা এ পরিমাণ টাকা দিতে অক্ষম তারা অর্ধেক অর্থাৎ ২০/-টাকা হারে আদায় করবেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বগুড়ায় ফিদিয়া মাথা পিছু ৭৫০/- এবং অবশিষ্ট স্থানে ৫৫০/- হারে নির্ধারণ করা হয়েছে। রমযানের শুরুতে গরীবদের মাঝে ফিতরানা বন্টন করতে বিশেষভাবে ব্যবস্থা নিবেন।

রযমানের শেষ দশদিন ই'তিকাফে বসার জন্য সদস্যদের অনুপ্রাণিত করবেন যাতে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিতে পারেন।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে মাহে রমযানের বরকত হাসিল করার ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার তৌফীক দিন, আমীন।

- মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত

ফ্রান্স জামাতের জলসা সালানা-২০০৩

অতুলনীয় বীরঙ্গনা জোয়ান অব আর্ক, সম্রাট নেপোলিয়ন, ভলটেয়ার, মোঁপাশা, রোঁমারোলা, ভিক্টর হুগোর দেশ ফ্রান্স। বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, মহাবীরের দেশ ফ্রান্সের মাটিতে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং আমাদের প্রিয় ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) পা রেখে পবিত্র করলেন। কেউ জানলো না কার পদধূলিতে এদেশ হলো ধন্য ও পবিত্র। ৩২টি জাতির সম্বনয়ে এ জামাত। যার মোট সংখ্যা ৭০০ জন। এবারের জলসা উপলক্ষ্যে এসেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে বেশ কিছু আহমদী ভাই-বোন। উল্লেখযোগ্য দেশসমূহ ছিলো England, Germany, Belgium, USA, Indonesia, India, Srilanka, Ghana, Nigeria, Spain, Pakistan। চমৎকার ভাবগম্ভীর পরিবেশে জলসার ১ম দিনের কর্ম শুরু হয়। হুযূর আকদস (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবার পর এবার অনেকটা আন্তর্জাতিক জলসার আকার ধারণ করে। স্থানাভাবে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও জলসাগাহে অনেকেই আসতে পারে নি।

দ্বিতীয়দিন ছিলো শনিবার। যথারীতি জলসার কাজ আরম্ভ হয়। বলতে গেলে দিনটি ছিলো বাংলাভাষা-ভাষীদের। সৌভাগ্য মোঃ আলী বাবুল সাহেবের, সৌভাগ্য খাকসারেরও। দিনটির দু'টি নযমই ছিলো বাংগালীদের। সকলেই বেশ উপভোগ করেছে। বাংগালীর উর্দূ নযম, খাকসারের ছিলো অনেক বড় সুযোগ। খাক্সারকে হুযূর আকদসের ব্যক্তিগত সহকারী নিজে ইন্টারভিউ নিয়েছেন। সাথে ছিলো France ও Indonesia জামাতের মোহতরম আমীরদ্বয়ের অকুণ্ঠ সমর্থন। একদিন হুযূরের সাথে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের পোশাকের বেশ প্রশংসা করলেন হুযূর আকদস (আইঃ)।

ফ্রান্সের জলসায় বাঙালী আহমদী ঃ বাম হতে সাঈদ আহমদ, মাকসুদ আহমদ, মোহাম্মদ আলী বাবুল, সাইফুল ইসলাম ও সৈয়দ রেজা শাকিল

বাংগালীদের সাক্ষাৎ ছিলো আলাদা আলাদাভাবে। সকল ভাইয়ের সাথে হুযূর বেশ হাসিখুশী আলোচনা করেছেন। এর মাঝে ব্যক্তিগত জীবন-কর্মময় ও বর্তমান পরিস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়।

সাইফুল ইসলাম ও সাঈদ আহমদ সাহেব বাংগালীদের মাঝে নতুন বয়াত গ্রহণকারী। সাইফুল সাহেব ৩ বছর ও সাঈদ সাহেব ১ বছর পূর্বে বয়াত গ্রহণ করেন। হুযূর আকদস তাদের সাথে সারগর্ভ আলোচনা করেন।

France-এ নতুন আহমদী হিসেবে মোঃ আলী বাবুল ও মাকসুদ আহমদ সাহেবদের জন্য হুযূর দোয়া করেন। তারা ছিলেন আবেগা - আপ্লুত।

তৃতীয় দিন অন্য দু'দিনের মত চমৎকার পরিবেশে জলসার কাজ শুরু হয়। দুপুরে আকর্ষণীয় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন অনেক জাতির আহমদী। চমৎকার একটি পরিবেশ তৈরী হয়।

সমাপ্তি অধিবেশনে হুযূর আকদস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জীবনীর উপর আলোচনার পর দোয়ার মধ্য দিয়ে জলসার সমাপ্তি টানেন।

- সৈয়দ মোঃ রেজা শাকিল
প্যারিস, ফ্রান্স

লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনার ১৬তম ইজতেমা সুসম্পন্ন

১৬তম বার্ষিক ইজতেমা লাজনার প্রেসিডেন্ট দীনা নাসরীনের সভাপতিত্বে খোদার ফযলে খুবই সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

লাজনা ও নাসেরাত সহ মোট ৫ গ্রুপের কুরআন তেলাওয়াত, নযম. বক্তৃতা, রচনা, দীনি মা'লুমাত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং বিভিন্ন গ্রুপের খেলাধূলা যেমন- পয়গাম রেসানী, কুইজ, বালিশবদল এবং স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা হয়। অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এতে মেহমান সহ ১০০জন লাজনা ও নাসেরাত বোন উপস্থিত ছিলেন।

- কোরায়শা মাজেদ
জেনারেল সেক্রেটারী
লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্র ১১তম ইজতেমা সুসম্পন্ন

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং সকাল ৯টায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্-এর ১১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ্। এতে লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদর মাকসুদা রহমান, সেক্রেটারী তবলীগ আনোয়ারা মুস্তাফিজ ও ঢাকা লাজনার প্রেসিডেন্ট রোকেয়া আহমদ, স্থানীয় জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শরীফা খাতুন বর্তমান প্রেসিডেন্ট মোহতরম আবেদা চৌধুরী ও অত্র জামাতের মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ সহ ৮৫ জন লাজনা, ৩৪ জন নাসেরাত, ৮ জন অতিথিসহ মোট ২২৫ জনের উপস্থিতিতে ইজতেমার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্দার আড়াল হতে স্থানীয় আমীর হেলাল উদ্দীন আহমদ উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে ১ম স্থান অধিকারীণী লাজনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করানো হয় এবং পুনরায় সিডিউল অনুসারে বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সভানেত্রীর ভাষণ, শোকরিয়া জ্ঞাপন, পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত হয় ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন সদর মাকসুদা রহমান।

- দিলরুবা বেগম
সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি
লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ

সন্তান লাভ

আল্লাহ্তাআলা তাঁর অশেষ কৃপায় পিতা হবার সৌভাগ্য দান করেছেন, আল্হামদুলিল্লাহ্। আমার স্ত্রী জনাবা শারমিন আক্তার শিখার গর্ভে লালিত পুত্র সন্তান গত ১৩ই অক্টোবর রোজ সোমবার দুপুর পৌণে বারোটার পৃথিবীর মুখ দেখেছে। আমরা তাকে ওয়াকফে নও স্কীম - এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য হুযূর (আইঃ)-এর সমীপে আবেদন করেছি। আমরা আমাদের সন্তানের দীর্ঘায়ু, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কল্যাণের জন্য আপনাদের সকলের দোয়া প্রার্থী। উল্লেখ্য নবজাতক শাহবাজপুর জামাতের মরহুম খন্দকার কামদার আলী সাহেবের পৌত্র।

- খন্দকার ইমতিয়াজ উদ্দীন আহমদ
তেজগাঁও জামাত

শুভ বিবাহ

❑ জনাব মরহুম আব্দুল জলিল-এর কন্যা মোসাম্মাৎ জাহানারা বেগম, সাং- কাজিপাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, এর বিয়ে মরহুম আব্দুল হক মুন্সী-এর পুত্র জনাব জহিরুল ইসলাম, সাং- সুহিলপুর, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে টাকা ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ০১/০৮/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ।

বিয়ের এলান করেন জনাব মৌঃ আব্দুস সালাম, পিতা জনাব ইব্রাহীম। ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৭৭/০৩ তারিখ ০৬/০৯/০৩।

❑ জনাব আল্‌হাজ্জ শেখ মোশার্‌রফ হোসেন-এর কন্যা মোসাম্মাৎ দীবা ফারহানা, সাং- কান্দিপাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, এর বিয়ে জনাব মোহাম্মদ আজগর আলী খান-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ নাছির আহমদ খান, সাং- পশ্চিম পাইক পাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ১৬/০৮/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

বিয়ের এলান করেন জনাব মৌঃ শামসুল ইসলাম, পিতা জনাব হাসন আলী, কান্দিপাড়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৭৮/০৩ তারিখ ০৬/০৯/০৩।

❑ জনাব নূর মোহাম্মদ সরকার-এর কন্যা মোসাম্মাৎ নূরুন্নাহার (রূপালী), সাং- তাহেরাবাদ, বাঘা, জেলা- রাজশাহী, এর বিয়ে মরহুম দেলোয়ার হোসেন-এর পুত্র জনাব জাকির হোসেন, সাং- টেকস্‌ দীঘির পাড়, মাহিগঞ্জ, জেলা- রংপুর-এর সাথে টাকা ১৪,০০১/= (চৌদ্দ হাজার এক) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ২১/০১/০৩ তারিখ রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তাহেরাবাদ কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ।

বিয়ের এলান করেন জনাব মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী, মোয়াল্লেম। ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৭৯/০৩ তারিখ ১৩/০৯/০৩।

❑ জনাব এম, কামাল-এর কন্যা মোসাম্মাৎ মোস্তারী পারভীন শিল্পী, সাং- কাজী পাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, এর বিয়ে জনাব আব্দুল মতিন-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আহসানুল হক, সাং- শ্যামপুর, জেলা- রংপুর-এর সাথে টাকা ৭৫,০০১/= (পঁচাত্তর হাজার এক) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ১১/০৪/০৩ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা দারুত তবলীগ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ।

বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৮০/০৩ তারিখ ১৩/০৯/০৩।

❑ জনাব মোহাম্মদ ফজলে এলাহী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ আয়েশা বেগম, সাং- ষোল শহর, ডাকঘর- চক বাজার, জেলা- চট্টগ্রাম, এর বিয়ে জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, সাং- মীর-পুর, জেলা- ঢাকা-এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ০৬/০৪/০৩ তারিখ, রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম মসজিদ বায়তুল বাসেতে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৮১/০৩ তারিখ ৩০/০৯/০৩।

❑ জনাব খন্দকার মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন-এর কন্যা মোসাম্মাৎ সায়রা খন্দকার (সুমী), সাং- সাগর পাড়া (বল্লভগঞ্জ), ঘোড়ামারা, জেলা- রাজশাহী-এর বিয়ে মরহুম রশীদুজ্জামান-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ সামসুজ্জামান, সাং- চর কাউরিয়া, মাঝপাড়া, থানা- বকশীগঞ্জ, জেলা- জামালপুর-এর সাথে টাকা ৭৫,০০০/= (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ১৩/০৫/০২ তারিখ, রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রাজশাহী কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ।

বিয়ের এলান করেন জনাব প্রফেসর ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম। ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৮২/০৩ তারিখ ০৩/০৯/০৩।

❑ জনাব সামসুল ইসলাম ভূঁইয়া-এর কন্যা মোসাম্মাৎ মানসুরা ইসলাম, সাং- হিলভিউ সোসাইটি, নবীনগর, বায়োজি, চট্টগ্রাম-এর বিয়ে জনাব ফারুক আহমেদ-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আবরার আহমদ, সাং- কান্দিপাড়া, পি, এইচ, রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে টাকা ২,০০,০০১/= (দুই লক্ষ এক) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ০৪/০৭/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম মসজিদ বায়তুল বাসেত-এ অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ।

বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৮৩/০৩ তারিখ ৩০/০৯/০৩।

❑ জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন-এর কন্যা মোসাম্মাৎ হাসিনা আক্তার, সাং- রোড নং-৮, বাসা নং-১, মোহাম্মদপুর হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২১৭-এর বিয়ে জনাব মোহাম্মদ রেজাউল আলম, সাং- এপার্টমেন্ট এ-১/৩, বাড়ি-৯/ডি, সড়ক-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭-এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মাত্র মোহরানা ধার্যে গত ০৩/১০/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌। ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৮৪/০৩ তারিখ ৩/১০/০৩।

এসব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্‌তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP

Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit.

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রূপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 66 ◆8th Issue — October 31, 2003 ◆Tk. 10.00

Fortnightly — The AHMADI — রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

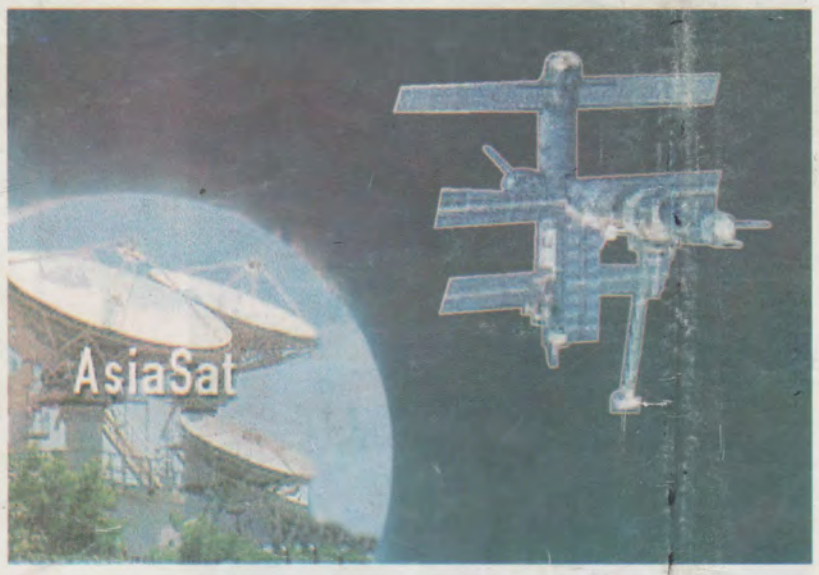

لا إله إلا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com